বেহুলা

মহাশ্বেতা দেবী

অন্তধারা
কলকাতা

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ : ১৩৬৮

প্রকাশক :
অন্তধারার পক্ষে
গীতা দত্ত
১২৯/৫৩ এস, এন, রায় রোড
কলিকাতা ৭০০০৩৮

মুদ্রাকর :
শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : শৈবাল দত্ত

উৎসর্গ

শকুন্তলা দেবী ও রণজিৎ রায়-কে

সূচীপত্র

গুরু

॥ এক ॥

রাত বাড়তে বাড়তে শীতলাতলার ঠেল্-এ এমন একটা জায়গায় পৌঁছয় যে ঘড়ির কাঁটা সময় নিরূপণে ব্যর্থ হয় ও নিজের মতো নিজে বারোটা—একটা—দেড়টা বাজিয়ে চলে, কিন্তু ঠেল্-এর সামনে বসে থাকা কুকুরটি জানে, এখন কিছুক্ষণ সময় মানুষী হিসেবের বাইরের মহাকাল। কলকাতা শহর এই সময়ে হঠাৎ শ্রান্ত শিশু হয় ও ঘুমিয়ে যায়। যেখানে আছে সেখানেই ঘুমিয়ে যায় শহর, বাড়িগুলো—রাস্তা —পথের বাতি—নোংরার স্তূপ—অর্ধসমাপ্ত ব্রিজটা—স্টেশনটা—সব।

এইরকম জাদু সময়ে কাঙালী তাকে খুঁজতে বেরোয়। কেন না এই সময়েই সে হারিয়ে যায়।

ঠেল্ বন্ধ হয়। কাঙালী, ভানু-নেলো ও পটলকে কনুই দিয়ে গুঁতো মারে। তারা উঠে পড়ে ও চলে যায় স্টেশনের ওভারব্রিজে। ভিখিরি-ভেণ্ডার-পকেটমার-মগাইদের ঠেলে ঠেলে ওরা তার ঘুমের জায়গা ঠিক করে এবং তিনজন তিন দিক পাহারা দেয়।

কাঙালী তাকে খুঁজতে যায় ঝড়ে পড়ে যাওয়া লাইট পোস্টের ওপর। এখন তাকে দেখা যায় না, কিন্তু তার গলা শোনা যায়। কথাগুলি জড়িত ও সুরটি অন্ধকার দেখে ভয় পাওয়া শিশুর মতো আর্ত। কথাগুলি এইরকম—

কে বলে এটা ইন্দ্রের ঐরাবত।
কামরূপী বারণ হয় কত মত॥
ডাকিনী পাড়াতে ছিল তাদের বাহন।
তাদের বাহন আমার বাহন এখন॥
চল্ বলতে নল চলে কামিখ্যার বরে।
এক পল বিলম্ব না কর, চল শীগগির ক'রে।
দোহাই মা কামিখ্যার বরে॥

কাঙালী এগোয়, সন্তর্পণে। এখানে বাজারের সারাদিনের কাদা, মাছের নাড়ি ও শাকপাতা পচে ভসভসে। কাঙালী ওকে দেখতে পায়। পোস্টটি জাপটে ও উপুড় হয়ে আছে। ও কাঁদে ও কান্নায় কাঁপে। কাশে।

—গুরু!

—কে?

—গুরু, চল।

—কাঙালী, আমি কামাখ্যার গাছচালানো মন্তর পড়েছি। ডাকিস না বাপ, গাছ নড়লেই আমি পৌঁছে যাব।

—গাছ কোথা গুরু? ও তো পোস্ট।

—নড়লেই আমি পৌঁছে যাব।

—কো'জ্জাবে গুরু?

—তোকে বলব কেন? দেওঘর যাচ্ছি, বত্তিনাথে। সেখানে জন্মেছিলাম তো, মায়ের পেটে ঢুকে যাব শ্‌লা। কোন্ হারামি আর বেরোয়।

—চোলে চল গুরু।

—যাব?

—চ্চ।

ও উঠে দাঁড়ায়। ওর কাদামাখা প্যান্ট, ঢবঢবে জুতো, নোংরা গেঞ্জি, সব চোখে পড়ে এখন। ওর বিস্মিত ও রক্তাভ চোখ। রুপোলি চুল। গলার মাদুলিটি হাত দিয়ে দেখে ও, এবং হাঁটতে থাকে। আস্তে। পায়ে ব্যথা।

রাস্তা। লাইন। রাস্তা। বাঁক। ওভারব্রিজ। ভানু, নেলো ও পটল ওকে শুইয়ে দেয়। মাথার নিচে কাগজের বাণ্ডিল। কাঙালী সযত্নে পকেট হাতড়ায় ও বলে—টাকাটা আমি রেখে দিলাম গুরু।

—দে।

—যাচ্ছি এখন।

—চাইলে একটা টাকা দিবি তো?

—দেব।

ও ঘুমিয়ে পড়ে। গুরু অথবা এভরিম্যানের ঘুম পাহারা দেয় ঠেল্-এর কুকুরটা। গুরু ওকে জড়িয়ে ঘুমোয়।

সব সময়েই ও বাস্তব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। দশবছর ধরে। বাস্তবকে অস্বীকার করতে চায় বলে ও নিজে বাস্তব ও অবাস্তবের গোধূলি-রেখা ধরে চলতে থাকে। অথচ সবসময়ে ও বাস্তবকে অস্বীকার করতে চায় নি। খুব সাধারণ সুখ - আরাম—স্বাচ্ছন্দ্য—শান্তি - ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। এখনো চায়। পারে নি সেভাবে বাঁচতে, পারে না। সুখ-আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য-শান্তি-ভালোবাসার চেহারার আড়ালে বসে হিংস্র ও নির্মম শোণিতপায়ী সময় ওকে ঠেলছিল। রাক্ষসের গুহার দিকে। আত্মরক্ষায় অক্ষম শিশুর মতো ও নিজেও সেদিকেই যাচ্ছিল। অন্ধকারটা ওকে খেয়ে নিচ্ছে।

সেইজন্যেই ও পথের অর্ধশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে বিশ্বাসী, স্বল্প রোজগারে কোনোমতে বেঁচে থাকা ছেলেদের 'গুরু' এবং এভরিম্যান। ছেলেরা জানে, গুরু খুব সামান্য চাকরি ক'রে সামান্য আবাসে থেকে, অল্পশিক্ষিতা কোনো প্রেমময়ী স্ত্রী ও সন্তানদের সাহচর্যে সামান্য জীবন যাপন করতে চেয়েছিল। ছেলেরা জানে আজকের সময়ে দৈত্য অথবা ব্যাঙাচি হয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব। ক্ষুধার্ত ও শোণিতপায়ী সময় একটা কামার। কামারশালায় মানুষদের গলানো ও ঢালাই করা ও ছাঁচে ফেলা হয়। দৈত্যদের হাতে পৃথিবী ধরিয়ে দেওয়া হয়, বামনদের ছুঁড়ে দেওয়া হয় রেল-চুরি—ছিনতাই—সিনেমা ও ফুটবলের টিকিট ব্ল্যাক—ইত্যাদি অন্ধকার কাজের কর্মশালায়। মাঝারিদের ঢালাই করা হয় দৈত্যদের টিকিয়ে রাখার জন্য। ওরা গাড়ি চড়বে, বাড়ি কিনবে, মদ খাবে, ক্লাবে যাবে বলে ফিডার মাঝারিরা কেরানি-শ্রমিক ইত্যাদি হয় ও য়ুনিয়ন ক'রে মরে। গুরু মাঝারি মানুষদের প্রতিনিধি। তাই ছেলেরা গুরুকে ঘিরে থাকে ও তার সুখ-দুঃখের শরিক হয়।

ছেলেগুলি কলকাতা। খেতে না পেলেও ওয়াগন ভাঙে না, মেয়েদের মা-বোন-বউদি জ্ঞানে দেখে, রাতবিরেতে মড়া পোড়ায়, দৈত্যাকার সমবয়সীদের দেখে ঈর্ষা করে না। এদের জন্যেই কলকাতা শহর তৈরি হয়েছিল, যদিও কলকাতা বর্তমানে তা মনে রাখে না পার্ক স্ট্রিটে, গড়িয়াহাটায়, বালিগঞ্জ সার্কুলারে। কুচো চিংড়ির খোসাপচা বাই-লেনের নোনাধরা বাড়ি দেখলে কলকাতার এদের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তা কচিৎ। কলকাতা নিজেও এখন আর নিজেকে এদের সঙ্গে এক ক'রে দেখতে পারে না। অলিম্পিয়া ও ব্রডওয়ের নিত্য খদ্দেরদের সঙ্গে এক হওয়া কলকাতার পক্ষে অনেক সোজা এখন।

কি করতে পারে গুরু এবং ছেলেরা? মন্ত্রীরা যখন চুরি করে বা ঘুষ নেয়, কলকাতা তাদের দলে। পুলিশ বা বিরোধীদল যখনি তরুণদের মারে, কলকাতা ঘাতকদের দলে। ব্যবসায়ী যখন কোটি টাকা লুটে নেয়, কলকাতা তাদের দলে। তদন্ত কমিশন যাদের হুমকিতে বন্ধ বা বিফল হয়, কলকাতা তাদের দলে।

কখনোই কলকাতা গুরুর দলে থাকতে চায় না। সেই জন্যেই শীতলা তলার ঠেল্ বন্ধ হবার সময়ে, ভানুমতীর প্রহরে, গুরু ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। আরেকটা দিনের মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করে না ওর। আবার সকাল। ওভারব্রিজ থেকে নামা। দোরে দোরে ঘোরা। একটা টাকা, এক পেয়ালা চা, এক থালা ভাত। সকলের চোখে আতংক। অবশেষে ছেলেরা। আবার মুড়ি ও বেসনের বড়া। শীতলাতলার ঠেল্ ব্যাগের জামা বা প্যান্ট বেচে। একসময়ে মদ মানে ছিল ইচ্ছে হলে যাওয়া। বার। বাজনা। লালচে আলো। প্রন পকোড়া। ডবল হুইস্কি কাচের আধারে। এখন ঠেল্-এর গন্ধ ওকে অধিকার করেছে। গন্ধ থেকে গন্ধে বয়ে চলা ওর। চোলাইয়ের গন্ধে পৌঁছে ও কেন আটকে গেল? না, আর মদ খাব না। কিন্তু না খেলেই সুন্দর ঘরদোরের, আপনজনদের ভালোবাসার গন্ধে ফিরে যাবার ইচ্ছে। অসম্ভব দূরে সে সব। অন্য নক্ষত্রে।

অন্য নক্ষত্রে। নক্ষত্রগুলির মধ্যবর্তী দুরতিক্রম্য দূরত্ব শুধু কোটি যোজনই নয়, তুষারশীতলও বটে। আর নক্ষত্রগুলি ভুল বোঝাবুঝিতে কোটি ডিগ্রি ফারেনহাইট। ও যেতে পারে না, যদিও যে-কোনো ট্রাম বা বাস বা হাঁটা-পথ ওকে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে নিতে পারে।

নিজের অক্ষমতায় ফুঁপিয়ে কেঁদে এবং নিজের ওপর ভীষণ প্রতি-শোধের বাসনায় ঠেল্। চোলাই। তারপর বাঁধা রুটিন। আঘাত চাই, শরীরে আঘাত। খিস্তি করে, ওপরচড়াও হয়ে মেরে অন্য চোলাই-সেবীকে আক্রমণ। ভীষণ মার। নাক-মুখ থেঁতলে যায়। যন্ত্রণা।

ছেলেরা দেখে যায়। বাধা দেয় না। ওরা জানে। গুরু চোলাইয়ের গন্ধ থেকে কোনো শেষ, শুচিতম গন্ধে উত্তীর্ণ হতে চাইছে। মধ্যবর্তী পন্থাগুলি সে কাজের রিচুয়াল।

তারপর ল্যাম্প পোস্টটির দিকে ছোটা। ডায়মণ্ডহারবারের নলিন হাড়ির কাছে, কামাখ্যাসিদ্ধ নলিন হাড়ির কাছে গুরু-মন্ত্রটা শেখে।

বছরখানেক আগে। ছেলেরা ওকে ডায়মণ্ডহারবার নিয়ে যায়। কাঙালী ওকে নিজের মাসির বাড়ি রাখে। মাসি স্বাবলম্বী মেয়েছেলে। চালাঘরে ছয়টা উনোনে নিজে এবং নিযুক্ত মেয়েরা মুড়ি ভাজে প্লাস্টিকের স্বচ্ছ বোরায় মুখ বেঁধে মুড়ি যায় শহরে। মেসো মেছো-বাজারে ফড়ে। ছেলেরা মুড়ি নিয়ে যায়। মেয়েরা স্বামীর ঘর করছে।

মাসি সকালে র়াঁধতে সময় পেত না। সকালে খেতে হতো পান্তা ভাত, মাসি বলত. পষ্টি ভাত। বিকেলে মেসো মাছ আনত। মাসি স্নান ক'রে র়াঁধতে বসত। যত্ন ক'রে র়াঁধত, যত্ন ক'রে খেতে দিত, যত্ন ক'রে বিছানা পেতে কালো মশারি টাঙিয়ে দিত। গায়ে হাত বুলিয়ে বলত, বাবা আমার বড় কষ্ট পেয়েচেন গো! মন্দিরে নে ঝাব।

মাসিই গল্প করেছিল নলিন হাড়ির। বলেছিল, কাঙালীর মেসোর বার-টান ছিল গো, ঘরে রইতুনি, সব্বদা ঝেয়ে উঠত বিস্তির ঘরে। তা বাদে নলিনকে ধম্মু মন্তর কম্মু, সে হতে আমার বশ।

গুরু বলেছিল, নলিন হাড়ি কে, মাসি ? চল দেখি আসি।

—সে মস্ত বড় গুণীন গো! কাঁউর-কামিখ্যে সিদ্ধ। মন্তর পড়ে নৌকো বেঁধে আখবে, মাচের ডিঙি চলবে না। ঝড় উটছে, দিক বেঁদে দেবে, ঝড় উটবে না। কি ঝানে আর কি ঝানে না নলিন ?

এত বড় সর্বশক্তিমান্ গুণীন আন্দাজে নলিনের ঘরদোর লজঝড়ে, চেহারা মড়িপোড়া। মাসি বলেছিল, গুণীন ঝে পয়সা নেবে নি কারোর ঠেঙে।

নলিন বলেছিল, পয়সা নিলে মন্তর খাটে না গো ক্ষ্যান্ত! পয়সা নিলে সব্বনাশ হয়। মায়ের ডাকিনী তক্ষুনি এসে মেরে রেকে যাবে।

গুরুকে ও মাতুর পেতে বসায়। নলিনের চোখ দু'টি এত মারণ-উচাটনে ব্যস্ত থাকার পরেও খুবই শান্ত ও মমতাবিধুর। ওর কাছে আসে তাপিত ও আর্ত ও পীড়িত। জীবন একটি দণ্ড। এক মাথা নেয়, অন্য মাথা দেয়। যারা দেয় তাদের দেখে দেখে নলিনের ব্যক্তিত্বে এসে গিয়েছিল মানুষী দুর্বলতা ও বিচ্যুতি বিষয়ে অসীম ও অশেষ ক্ষমা, সহিষ্ণুতা।

গুরুকে ও চা এনে দেয় দোকান থেকে। তারপর হলদেটে, পিঁচুটি-পড়া চোখের মমতায় গুরুর ক্ষতবিক্ষত মনে হাত বুলিয়ে ও বলে, বাবা, অনেক আস্তা ঘুরে এত ছ্যাচা খেয়ে তবে নলিনেরে মনে হল ? এর আগে আসতে হতো।

—তাতে কি হতো ?

—আপনি তো জানেন বাবা।

—আমি ?

—দেকেই বুঝিছি আগ-ঝাল আকতে পার না মনে। নিজে মত্তে ঝান, অন্যকে মাত্তে ঝান না।

দু'জনের মনে তখনি এক আশ্চর্য কামারাদোরি স্থাপিত হয়। নলিনকে ওর মনে হয় বুদ্ধ কিংবা চৈতন্য। কিংবা তাঁদের চেয়েও জ্ঞানী। কেন না গুরু যা নয়, অথবা যা হয়েও ধরে রাখতে পারে নি, সেই বড়

চাকুরে, বিশাল কৃতী, মস্ত মানুষ নয় বলে নলিন গুরুকে কাঠগড়ায় তোলে নি। গুরুর সমস্ত ব্যর্থতা ও বিফলতাসহই তাকে মেনে নিয়েছিল এবং সেই বিন্দু থেকে, এক আশ্চর্য বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতায় দিগন্ত হাট ক'রে খুলে দিয়েছিল।

ও বলত, আমি যেখানে ছিলাম, সেখানে মানুষজন আপনার মতন হলে আজ আমার এ অবস্থা হতো না। বলতে বলতেই বলত, জানেন আমি খুব মন্দ, খুব পাপ করেছি। তার ক্ষমা হয় না।

নলিন বলত, সব কেটে ঝাবে। এ দশা কেটে ঝাবে যকন, তকন নলিনকে মনে করবেন।

—আমি আর যাচ্ছি না কোথাও।

মাসির সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছিল। ডায়মণ্ডহারবার থেকে ও বস্তা বোঝাই মুড়ি নিয়ে বালিগঞ্জে-শেয়ালদায় পৌঁছবে। মুড়ির কাজের সঙ্গে সঙ্গে মেসোর কাছে মাছের ফড়ে-কারবারও শিখে নেবে। বাস্তব →অবাস্তব→বাস্তব→অবাস্তব, এতে ক্লান্ত, ক্লান্ত, ক্লান্ত গুরু। এবং রিচুয়ালিস্টিকালি ঠেল্-এ মোদো মাতালদের খুঁচিয়ে মারতে উশ্কানি দিয়ে তাদের হাতে মার খাবার জন্যে গুরুর শরীরে বিভিন্ন ক্ষতি ও জখম। মাসির প্রচ্ছায়ে একটা সাধারণ জীবন গড়ে নেওয়া খুব লোভনীয় মনে হয় গুরুর। এবং জীবনের উদ্দেশ্য পেয়ে গিয়ে ও সেই মতো খাটতে থাকে।

নলিনকে খোঁচাতে থাকে, আপনি আমায় শিখিয়ে দেবেন না? বলেছিলেন যে?

নলিন বলে, হবে হবে।

সেও দেখতে থাকে গুরুর শিক্ষার ইচ্ছা যথেষ্ট খাঁটি কি না। বলে, বাইরে চলে যাবেন, এখেনে তো রইবেন না, তাতেই শেকাতে মন যায় নে। কত ঝনারে শেকালাম, কত ঝনা কাট মাল্লে, মন ভেঙে যায়।

—না না। যাব না।

গুরু ভীষণ ভয় খেয়ে যায়। আবার সে যাবে কেন? সে তো

এখানেই থাকতে চায়। অসীম, অশেষ সুখ হয় তার মাসির বাড়ি পান্তি ভাত খেয়ে, মাতুরে গড়িয়ে পড়ে। ছেলেদের ট্রেনে তুলে দিয়ে, সন্ধ্যায় ওদের সঙ্গে নদীর পাড়ে বসে মুকেশের গান গেয়ে। 'সন্সার হ্যায় এক নদীয়াঁ' গানে তার গলায় বিষাদ ঔদাসীন্য ও আত্মসমর্পণ, মুকেশের চেয়ে অনেক গভীর হয়, রক্তে কান্না জাগানো। মুকেশ গানটি গেয়েছে, কিন্তু একা গুরুই জানে সংসার নদীর মতো বয়ে যায়, গুরুকে থাকতে হয় তীরে দাঁড়িয়ে, যে ঘরে বা পারে নেই, মাঝখানে আছে, তাকে সন্ধ্যাবেলায় কেউ ডেকে নেয় না কাছে।

অবশেষে একদিন নলিন নিশ্চিত হয়। দ্রোণ ও একলব্য। বলে, শনিবার নিরামিষ খাবেন। সাঁজ হলে চ্যান ক'রে চলে আসবেন।

সন্ধেবেলা জানা যায় নলিন নিজেও উপোস ক'রে আছে। তা জেনে গুরুর মনে ব্যাপারটি সম্পর্কে সমীহ জাগে। কামাখ্যাতন্ত্র যা বলছে, তা সত্যি কিনা তার জন্যে সমীহ জাগে না, সমীহ জাগে এই জন্যে যে নলিনের কাছে সমগ্র ব্যাপারটি ডায়মণ্ডহারবারের গঙ্গার মতোই সত্য। নিজের কথা সে ভাবে না। মনটা ক'রে ফেলে মাসির কাছে থাকার মতো বিশ্বাসী, এবং নলিনের সামনে বসে লাল কম্বলের ময়লা আসনে।

নলিন বলে, মনটা শুদ্ধ করুন। এই আমার হাতের দিকে চেয়ে থাকবেন, চোক ওটাবেন না। আজ আপনাকে গাচ-চালন মন্তর শেকাব।

খুব ভক্তিভরে গুরু মন্ত্রটি শেখে। একবারও মনে হয় না কোথায় পাবে শিশুগাছ, কেমন ক'রে সাত রবিবার সূর্যনারায়ণের পুজো করবে, পূর্ণ চাঁদের আলোয় ইস্পাতের কুড়োলে সে গাছ কাটবে। এসব তারাই করতে পারে যাদের জীবনে নোঙর আছে। থিতুভিতু আছে। গুরু কি ভেবেছিল, এইসব করতে করতে জীবনে স্থিতি এসে যাবে একদিন? আর ঘুরতে হবে না নিরাশ্রয়, গৃহহীন, কলকাতার পথে পথে? তার অতীত দৈত্য হয়ে এসে তাকে আবার উদ্বাস্তু ক'রে

ফেলবে না? আর চোলাইয়ের গন্ধ, যে গন্ধ তাকে অধিকারে রাখে, সে গন্ধ তাড়া করবে না ওকে আবার?

যেহেতু গুরু ব্যক্তিও বটে, এভরিম্যানও বটে, সেহেতু নলিনের সঙ্গে ওর যোগাযোগটা খুব ঠিক হয়েছিল। নলিন পায়োরিয়া-পচা মাড়ির দুর্গন্ধ ছড়িয়ে হেসে বলে, কতা আচে।

—কি?

নলিন, ব্র্যাডবেরির প্রাজ্ঞতায়, বলে, এ মন্তরে শুদু যেতা ইচ্ছে সেতা ঝেতে পারবে না, তা বাদে যে টাইমে ইচ্ছে ঝেতে পারবে।

—কেমন?

—ধর তুমি ছোটোটি হয়ে ঝেতে চাও, যুবো হয়ে ঝেতে চাও, তাই পারবে।

গুরু এবার স্থির বোঝে, স্ব-ক্ষমতায় বিশ্বাস করতে করতে নলিন পুরো পাগল হয়েছে। তাই খুবই আনন্দ হয়, এবং বলে, তা যদি হতে পারি, তাহলে ফিরে খুব ভাল হয়ে বাঁচব।

তার জানতে ইচ্ছে হয়, নলিন বিলিতি বিজ্ঞান-উপন্যাস পড়ে কি না? টাইমে ট্র্যাভেলের কথা ও জানল কি ক'রে? কামাখ্যা-তন্ত্র বইয়ে নিশ্চয় এসব কথা লেখা নেই? কিছুই জিগ্যেস করে না ও, কেননা ও জানে, নলিন কোনো সদুত্তর দিতে পারবে না। ও বোঝে, অশিক্ষিত নলিন ও শিক্ষিত ব্র্যাডবেরি দু'জনেই সমকালীন সময়ের ভয়াবহ চেহারা দেখে টাইম-ট্র্যাভেল ও স্পেস-ট্র্যাভেলের গ্যাঁজায় পলায়ন ক'রে সংবেদনী মনটা বাঁচাতে চাইছেন। গভীর মমতায় ও নলিনকে নিজের টর্চটি দিয়ে দেয়। বলে, গুরুদক্ষিণা—এবং জোনাকি-ওড়া জোলো আঁধারে মহানন্দ বুকে নিয়ে ঘরে ফেরে। সুগভীর এক নিরাপত্তাবোধ। মাসি আছে, নলিন আছে, এদের সঙ্গে ওর মনের এবং মানসিকতার আশ্চর্য মিল আছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষায় দষ্ট নয় এরা, খুব সাধারণ জীবনে তৃপ্ত।

খুব চেষ্টা করে ও। মেসোর সঙ্গে মেছোবাজারে ঘুরতে থাকে।

মেসো বলে, শ পাঁচেক টাকা পুঁজি হলে হেথা হতে মাচ কিনলে, টেন রয়েচে, টেনে চেপে নে গেলে, কলকাতায় পাইকারকে বেচে দে চলে এলে, নিত্যি লাভ রইবে।

মাসী বলে, তা বাদে হেথাতে জমি কিনলে এট্টা ঘর হল। বে করলে, শান্তিতে রইলে।

'পাঁচশো টাকা' বলতেই ওর মনে হয় কাকার পাথর-পাথর মুখ। কথা। 'আগে প্রমাণ কর তুমি মানুষ। মদ খাচ্ছ না। তারপর টাকার কথা ভাবা যাবে।'

কাকার কথা ভাবতেই ওর মনে ফ্ল্যাশব্যাক ঘটে। সুখী শৈশব। নিরাপদ কৈশোর। চিন্তাহীন যৌবন। ও চিন্তাহীন, কিন্তু সকলের চোখে নৈরাশ্য। উচ্চাকাঙ্ক্ষায় দষ্ট, জীবনে ওপরে ওঠা, ক্রমাগত ওপরে উঠে-চলা পরিবারে এত সাধারণ কেন ও? কেন ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। এত সাধারণ একটা চাকরি পেতেই এত খুশি কেন। কিছু না ভেবেই বিয়ে ক'রে ফেলা। তখন দাদারা এবং দিদিরা এবং কাকা সবাই খুশি। মেয়েটির প্রতি ওঁদের মন তখনি রেসপন্ড করে। মেয়েটি ওকে স্থির থাকতে দেবে না। নির্মম তাড়নায় ওকে ওপরে তুলবে এবং তুলবে। মেয়েটিও নিশ্চয় তা বিশ্বাস করে। নইলে ওকে বিয়ে করবে কেন? সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া, পড়াশুনোয় হীরের মতো মেয়ে?

তখন ও স্ত্রীর হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয় এবং কিছু বুঝতে পারার আগেই দেখে, সরকারী আপিসের ঘিনঘিনে কাজ ছেড়ে ও এক ঝকঝকে ফার্টিলাইজার প্রস্তুতকারক কোম্পানির মার্কেটিং একজিকিউটিভ হয়েছে। সবাই ওকে অভিনন্দন জানিয়ে যায় ও বাড়ির সামনে থেকে ওর আপনজনদের নিয়ে হুইশ্ হুইশ্ শব্দে অ্যামবাসাডারের পর অ্যামবাসাডর বেরিয়ে যে-যার ক্লাবে চলে যায়। স্ত্রীর চোখের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন নিতে নিতে ও বলে, 'একটা ফুলস্টপ কিন্তু থাকবে। নইলে আমরা ওদের মতো কার্সড্ হয়ে যাব। প্রত্যেকের নিজের ফ্ল্যাট, স্টেটাস সিম্বলের সবকিছু আছে। এবং প্রত্যেকে বেজায় অসুখী। ছেলে-

মেয়েরা আয়ার কাছে থাকে। মা-বাবার সঙ্গ পায় না। তারা অসুখী। বাপ-মা যে-যার জীবন নিয়ে থাকে। কারো মুখে সুখের আভাস নেই। আমার ভয় লাগত। আমি কিছু চাই না, সুখী হতে চাই।'

স্ত্রী তখন হেসে চুপ ক'রে যায় এবং ওর জীবনে সুচতুর সংগ্রামী বুদ্ধিতে এনে দেয় পার্টির সন্ধ্যার গোলাপের গন্ধ, কাচের গেলাসে বরফ ও পানীয়ের ঠাণ্ডা গন্ধ, নিজের ফরাসি সুগন্ধি উগ্র গন্ধ। ও ভেসে যায়, ভেসে যেতে থাকে। ক্লাবের মেম্বার হও। অফিসের নির্দেশ। যারা সারা ভারতের দরিদ্রতম নাগরিক চাষীদের জন্যে সার বেচে, তাদের মার্কেটিং একজিকিউটিভ ক্লাবের মেম্বার হওয়া আবশ্যিক। বাড়িতে পার্টি। খরচ কোম্পানির। স্ত্রী ওকে ভালোবাসে। প্রবল ও ক্ষুধিত ভালোবাসা। বাংলা বা বোম্বাই ছবির নায়কের চেয়েও দ্রুতগতিতে ওকে বদলে দিতে থাকে।

ভয়। মাঝে মাঝে নৈশ একাকিত্বে। ঘুম-না-আসা প্রহরে ভীষণ ভয়। এ রকম করলে আমি অজগরের পেটে চলে যাব। আমি ভীষণ দুর্বল। মা জানতেন। বাবা। তাঁরা নেই। আমাকে বাঁচাবার কেউ নেই। যাদের ইমেজ আমাকে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, তারা আমার অত্যন্ত আপনার। কিন্তু অজগর ওদের হজম ক'রে ফেলেছে। ওকে কালকেই বলব। এখনি পরস্পরের সঙ্গে কাটাবার সময়ে টান ধরেছে।

বলতে পারে না। এবং একদিন স্ত্রী ওকে বিজয়গর্বে বলে, সে নিজেও কাজে জয়েন করছে। বিদেশে ভারতীয় পোশাক ও শাড়ি রপ্তানির সুবিশাল র‍্যাকেটে। 'আমি শাড়ি ও পোশাক মডেল করব। আমার ফিগার ও বিউটি নিয়ে বাড়িতে বসে বসে পচাটা কোনো কাজের কথা নয়।'

কেন? ও-র মনে বিপদের সংকেত বাজে। যারা ওকে শৈশব থেকে হীনমন্যতায় ভুগিয়েছে, তাদের কি ভূমিকা আছে এতে? সেকথা বলতে স্ত্রী ক্ষেপে যায় ও রাগে জ্বলতে জ্বলতে অসামান্য সুন্দর চেহারা

নিয়ে ঘরে দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলে যায় নিজের বক্তব্য। ও কোন একক মানুষকে বিয়ে করে নি। সমগ্র পরিবারকে। স্বামীর মাথায় কোথাও কিংক্ আছে নিশ্চয়। যে কোনো লোক উড হ্যাভ বিন মাইটি প্রাউড অফ সাচ এ ফ্যামিলি।

—আই অ্যাম।

—হোয়াই অ্যাক্ট ফানি ?

—ওরা অল্‌রাইট। কিন্তু ভীষণ ব্যারেন ওদের জীবন। আমি আমার মতো সুখে থাকতে চাই।

—ইউ ক্যান।

– শোনো, প্লিজ শোনো···

স্ত্রী ভীষণ কাঁদতে থাকে। ও বেজায় ঘাবড়ে যায় এবং নিজেকে মনে হয় পশু। এত রূপ এবং ভাল ফিগার এবং য়ুরোপে ভারতের রাজস্থানি-কাশ্মিরি-গুজরাটি-পাঞ্জাবি মেয়েদের পোশাকের এত চাহিদা এবং অদৃশ্য নিয়ন্ত্রাদের চাপ এত বেশি যে ও বলে, ‘কর কাজ। যদি তাতেই তোমার ভাল লাগে।’ এই সাতটি কথায় মন্ত্রের মত কাজ করে এবং ওরা সুখী হয়। তারপর স্ত্রীর অত্যাধিক বাইরে থাকা এবং এবং স্ত্রীর কাজের কারণে ওর বাড়ি হঠাৎ সভ্য হয়ে ওঠা এবং বাড়িতে ওর আপনজনদের ঘনঘন আনাগোনা, ওর মুখেও হাসি থাকে কিন্তু মনে ভয় বাড়তে থাকে। স্ত্রী, উক্ত কোম্পানির জিনিসপত্র নিয়ে একদিন টা টা জানিয়ে উড়োজাহাজে উড়ে যায় অস্‌লো-তে ভারতীয় প্যাভিলিঅনে মডেল হতে। শূন্য গৃহে ফিরে ও বোঝে যে ওর জীবন খুব বিপন্ন এখন। ভয় পায়। বারে গিয়ে বসে।

মদের গেলাসে বহু ভ্রূকুটি ও তাচ্ছিল্য। প্রতিপক্ষের। যে প্রতিপক্ষ আপনজন। ওরা শক্তিমান, তাই এস্‌কেপ খোঁজে না। ও দুর্বল। পালাতে চাইছে। পালাতে চায় দুর্বল ও কাপুরুষ। পালাতে চাওয়া মহাপাপ। মনে মনে ও অদেখা ছায়াদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং টেবিল-চেয়ার ভেঙে গণ্ডগোল করে। ওকে জোর ক’রে বের ক’রে

দিতে ওর মনে এক ধরনের সান্ত্বনার অনুভূতি। আমি অন্যায় করছিলাম। ওরা বেশ করেছে।

এবং প্রায়ই। একমাস বাদে স্ত্রী ফিরে এসে দুঃখে ও রাগে ফেটে পড়ে। কাকা ও দাদাদের কঠিন কথা, এ রকম তুমি করতে পার না।

স্বল্প আলাপের বন্ধু অ্যালকোহল ওকে মনের কোথাও ফিলিপ জোগায়। 'আমাদের সমস্যার সমাধান আমরাই করব, তোমরা মাথা ঘামিও না'—ওর এ কথাগুলির কোনো দামই থাকে না। কেন না সকলেই অত্যন্ত কাতর ও উদ্বিগ্ন। এবং স্ত্রী ওদের নাকগলানো চায়। তারপরেও ও স্ত্রীকে বলে, দু'জনেই কাজ ছেড়ে দিই এস। আবার গোড়া থেকে শুরু করা যাক।

স্ত্রী রাজি হয় না। সময়, অভিশপ্ত সময়। নৈঃসঙ্গ্যের ভয়। মদ। ক্রমে মদের গন্ধ ওকে অধিকার করতে থাকে। ভয়। মদ খেয়ে প্রতিটি আপনজনের বাড়ি গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে ওরা ওকে গ্রহণ করবে, না বর্জন। এ অবস্থায় এখানে এস না। যখন ভালো থাকবে···

ও বলে, ভালো আমি নেই বলেই মদ খাচ্ছি। আমি আমার মতো বেশ ছিলাম, তোমরা কেন···?

বলতে বলতেই বোঝে, ওর কথাগুলি খুব অবাস্তব শোনাচ্ছে পরিবারের ইতিহাস হল সাফল্য-কাহিনী। ওকে কে অন্যায় কি বলেছে? তুই ছিলি সরকারী আপিসে যাকে বলে কর্মচারী। সেখান থেকে তুলে এনে বড় কাজে বসানো কি অন্যায়? তোর স্ত্রী যদি নিজের যোগ্যতায় ফ্যাশনেব্‌ল কাজ করে, সে কি অন্যায়? তুমি কেন নিঃসঙ্গ এবং কেন এ রকম জীবন পছন্দ কর না? একই বাড়ির ছেলেমেয়ে সবাই। সবসময়ে শৈশবের উল্লেখ কোরো না। তুমি শিশু নও। খুব সৌভাগ্য বাবা-মার অবর্তমানে কাকাকে পেয়েছিলে। তোমার দাদারা এবং ভগ্নীপতিরা তেল-জাহাজ-চা-ব্যাংক—বিশাল ব্যাপার সবার। তোমাকে সকলেই ভালোবাসে এবং তোমাকে নিজেদের সমান পর্যায়ে দেখতে চায়। সংস্কৃতি? কোন ছবি দেখে

না ওরা, কোন বই পড়ে না ? সংগীত, চিত্রকলা, কোনটার পৃষ্ঠপোষক নয় কে ?

ওর ধারণা হয়, সব ব্যাপারটাই ওকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। আসলে ও গণ্ডগোলের সূত্রটা ধরতে পারছে না। স্ত্রীকে কথা দেয় আর এ রকম করব না এবং স্ত্রীর কাছে যেন মরিয়া হয়ে আশ্বাস চায়, তুমি বল, সব ঠিক আছে। স্ত্রী ওকে আশ্বাস দেয় ও বলে, আমাকে একবার দিল্লি যেতে হচ্ছে। তুমি ঠিক থেকো।

—কাজটা ছেড়ে দিলে হয়না ?

—না।

—আমাদের যদি একটি সন্তান থাকত···

—এই রোজগারে ?

সাড়ে তিন হাজার জয়েন্ট রোজগারও সন্তান কামনার পক্ষে যথেষ্ট নয় জেনে ও খুব ঘাবড়ে যায়। আবার বারের গন্ধ ওকে অধিকার করতে থাকে এবং কোথাও মস্তিষ্কে কোনো একটা নিজেকে ভালোবাসার ও বাঁচিয়ে চলার বোধের সীমারেখা ও নিজেই ক্রস্ ক'রে চলে যায়। সর্বদা মনে থাকে হাহাকার বোধ। যেন শিশুর জগৎ মা-বাবা বিশ্বাসের জনরা ভেঙে দিচ্ছে, শিশু অসভ্য আচরণ ক'রে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায় অসহায় হয়ে। সেই একই মনোভাব থেকে বারে ও বন্ধুদের মদের আড্ডায় ওর অসভ্য আচরণ। কিন্তু নিজেও বোঝে ব্যাপারটি অবাস্তব হয়ে যাচ্ছে। কেন না যারা ওর জীবন ভেঙে দিচ্ছে বলে ও মনে করে, ১. তারা তা জানে না ও নিজেদেরকে মনে করে ওর শুভার্থী, ওর এই ক্রমে ভেঙে যাবার ব্যাপারে তারাও ব্যথিত হয় ; ২. বার ও ঠেকের বন্ধুদের এতে কোনো ভূমিকা নেই।

তবু পেটে মদ পড়লেই প্রেতভয়। অত্যন্ত দৈত্যাকার মানুষদের ছায়া ওকে অন্ধকার ক'রে দিচ্ছে। যে ওকে বাঁচাতে পারে সে অপরূপ লাবণ্য এবং ছত্রিশ-তেইশ-ছত্রিশ ফিগার নিয়ে ঘরে পচতে রাজি নয়।

তাই টেবিল ভাঙো, চেয়ার, আমি সুপারম্যান, আমি সব করতে পারি। আরেক মোদো মাতাল মুখে ঘুষি মারতে চশমা ভেঙে মুখ কেটে রক্ত পড়তে ও ওর স্যালভেশন খুঁজে পেয়েছিল। গভীর, গভীর, কৃতজ্ঞতাবোধ লোকটির প্রতি। হেসে (এবং হাসলে ওকে একেবারে অসহায়, মনোযোগ-কামী শিশু মনে হয়), কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে আরেকটি ঘুষি। মাথায় প্রবল যন্ত্রণা। কে ওকে ছুঁড়ে ফেলল পথে। কারা পকেট থেকে পার্স তুলে নিচ্ছে, হাত থেকে খুলে নিচ্ছে ঘড়ি, পা থেকে চীনে বাড়ির জুতো। সবকিছুরই আবার-বিক্রির দাম আছে, ওর নেই। সেদিন ও রাত তিনটেয় চেতনা ফিরে পায় ও খালি পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরে। স্ত্রী দরজা খুলে দেয়। চেঁচিয়ে ওঠে। ও নিজেই বাথরুমে যায়, ডেটল লাগায় মুখে। ঘরে এসে দেখে স্ত্রী অন্য ঘরে, দরজা বন্ধ। ওর মনে মুক্তি। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলা। শোনো, আমার কথা শোনো। লোকটা মেরে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। আমি বুঝেছি, এভাবে আমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। আজকের অভিজ্ঞতাটা আমাকে ফিরে আসতে সাহায্য করবে। তোমার সাহায্য চাই শুধু। আমার বাবা জীবনে খুব ব্যর্থ লোক ছিলেন। চা-ম্যাগনেট ভাইয়ের পাশে কেন্নো। ব্যর্থতা কুড়িয়ে ঘরে ফিরতেন। মা সবসময়ে তাঁকে সহায়তা করতেন হাসিমুখে পাশে থেকে। দাদারা, দিদিরা, ব্যাকগ্রাউণ্ড মনে করতে লজ্জা পায়, এবং কাকার নিয়মিত আনাগোনা ওদের মনে সূর্য পানে লাফ মারবার ইচ্ছের বীজ বুনে দেয়। সূর্যের দিকে লাফ মারা অনেক রকম হয়। সোশাল ক্লাইমবিং সব নয়। আমার বারের বন্ধু দীপ মিত্র অসামান্য ছবি আঁকে, মদ খেয়ে হয়তো মরে যাবে। কিন্তু ও সূর্যের দিকে ঠিক উদ্দেশ্যে লাফ মেরেছে। শোনো, তুমি আমার পাশে থাকো, আমি ঠিক পারব। একটা ফেরার মতো ঘর, একটি সন্তান। শোনো, সাড়ে তিন হাজার ডার্টি মানি। সন্তান একাধিক আসতে পারে। সরকারী আপিসে আমার কলিগরা কত কম টাকায় কি দুঃসাহসে পিতা হতো,

আমরা সন্দেশ খেতাম। শোনো, শহর আমাদের নষ্ট ক'রে দিচ্ছে। লেট্স বি অর্ডিনারি, নট এক্সট্রা অর্ডিনারি। সাধারণ হওয়া খুব কঠিন। বড়দা টি. ভি. বদলে টি. ভি. কিনতে পারে, কিন্তু বউদি আর রানার সঙ্গে একটা সন্ধে কাটাতে পারে না। বাবার মতো দুঃসাহসে পুজোয় ছিটের জামা ছেলে-মেয়ের হাতে দিতে পারে না। সিন্থেটিক পোশাক হাতে বাড়িতে ঢোকে। ওরা খুব ভালো কিন্তু সবাই সিনথেটিক।

সব কথা বলে ও ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমোবার আগে কেঁদে ফেলে ও বলে, এত কথা বলছি, তুমি আমার মুখে একটু আঙ্গুল বুলিয়ে দিতে পার না? মদ খেয়েছি, কিন্তু কেটেও তো গেছে। মদ তো আমি খেতাম না রুন্‌কি, তুমি কেন কখনো বাড়ি থাকো না? কেন তুমি বদলে গেলে, দূরে চলে গেলে? আমার বুঝি কষ্ট হয় না?

ও ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করে স্ত্রী ওর কাকার কাছে চলে গেছে। সেখানে যায় ও আবার ক্ষমা চাইতে ও স্ত্রীকে ডাকতে। সেখানে গিয়ে ও ফুল টেব্‌ল ইংকুআরি কমিশন বা ইংইকুজিশনের সম্মুখীন হয়।

—তুই ও রকম করলি?—বলে স্নেহময়ী বড়দি সুবাসিত রুমালে কেঁদে ফেলেন।

—কি করেছি?—প্রত্যেকটি চোখে অভিযোগ এবং ওকে সুপার-ম্যান হতে হবে আবার। এ ঘরে কেউ মদ খায় নি এবং বারের গন্ধ—রক্তের গন্ধ—রাস্তায় শুয়ে থাকাব গন্ধ ওকে তাড়া ক'রে আসে।

কাকা বলেন, তুমি শেষ অবধি ঘড়ি-জুতো বেচে মদ খাচ্ছ? বারে অসভ্যতা ক'রে···না,—রুনকি ফিরে যাবে না, টিল য়ু এমেনড ইওর ওয়েজ্।

স্ত্রী ওর চোখে-চোখ রাখে না। দাদারা মাথা নাড়েন। গভীর হতাশা। আশাভঙ্গ। ও সবার সামনে স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চায়।

অতঃপর সবাই আসতে থাকে ঘনঘন। সর্বদা ওকে নজর রাখে

এবং স্ত্রীকে জানিয়ে চলে, এ পরিবার অত্যন্ত দায়িত্বশীল। সবাই রুনকির সঙ্গে আছে। ওকে সবাই দেখে গভীর অবিশ্বাসে এবং ছোট বোনের বাচ্চাকে ও লুফে আদর করতে গেলে বোন 'না' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। অথচ এ সময়টা ও মদ খায় না। না-খাওয়ার পরেও ইত্যাকার ব্যবহারে ওর মনে রাগ জমতে থাকে। এই সময়ে স্ত্রীর বড় বোন এসে পড়েন টরনটো থেকে, এবং ওকে বলেন, এটা প্রবলেম। ম্যারেজ সেভ্ করার জন্য কন্‌সাল্ট কর সাইকিআট্রিস্টকে। দু-পক্ষের আত্মীয়-স্বজনকে স্ত্রীই ঢোকায় ওদের জীবনে, এবং ওর সঙ্গে শয়ন করে না, বলে এখনো মনে মনে ভরসা পাই নি। ও বলতে পারে না, এসব করলে বারের গন্ধ ওকে আবার দখল করবে। স্ত্রী ওকে বিশ্বাস পায় না জেনে ও আরো অসহায় হয়। মনের ভাসমান অবস্থায় একদিন ফিরে এসে দেখে চিঠি। মনের এই টেনশন কাটাতে স্ত্রী ননদ নন্দাইয়ের সঙ্গে দীঘা যাচ্ছে, ও যেন ফলো করে।

ও ফলো করে বারের গন্ধকে। বেজায় রাগে ও হতাশায়। এবার বাড়ি ফেরার সময়ে থ্যাঁৎলানো মুখে ও বাড়িতে নামতে পারে না। ভয় পায়। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলে, আমাকে যেখানে হয় নিয়ে চলুন। —ড্রাইভার ওকে থানা অভিমুখে নিয়ে যায় এবং যাবার সময় হঠাৎ ও সভয়ে দেখে লোআর সার্কুলারের দু'পাশে সবগুলো বাড়ি ওদের তেলিপাড়া লেনের হলদে একতলা বাড়ি হয়ে গেছে। প্রতি বাড়ির কাঠের শিক বসানো জানলায় বাবার প্রতীক্ষায় মায়ের উৎকণ্ঠাভরা মুখ। দেখে ও হা হা ক'রে কেঁদে ওঠে ও ড্রাইভার ঝটপট ওকে থানার সামনে নামিয়ে পকেট থেকে পার্স ছোঁ মেরে নিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। থানার লক-আপ। দুর্গন্ধ সে কামরা অনেক স্বাগত ওর কাছে। পরদিন আদালত। পঁচিশ টাকা জরিমানা। আদালতের টাউটের সঙ্গে ছোড়দার বাড়ি। বউদি ছুঁড়ে দেয় টাকা ও দরজা বন্ধ ক'রে দেয়। টেলিফোনে জরুরি খবর চলতে থাকে। কাকা ফেটে পড়েন চিররুগ্না ও শয্যাশায়িনী কাকিমা বলেন, সবাই মিলে ওকে ওরকম

কোরো না, স্ত্রীকে আর ওকে নিজেদের বোঝাপড়া ক'রে নিতে দাও। —কেউ তারা কথা শোনে না এবং স্ত্রী যখন দীঘা থেকে ফেরে তখন আবার মদ না খেয়ে তার সামনে যেতে সাহস পায় না।

এভাবে ধস্ নামতে থাকে এবং এরই মধ্যে, যখন ও অতল থেকে অতলে নামছে, হঠাৎ পথে দেখা হয় সরকারী অফিস-জীবনের হরিলালের সঙ্গে। বেয়ারা। হরিলাল ওকে নমস্কার করে। বলে, এতবার বলেছেন, এবার চলুন।

—কোথায়?

—আমার দেশের বাড়ি? সেবার সবাই যাবেন, পিকনিক করবেন, তা আপনি তো বড় চাকরি নিয়ে চলে গেলেন।

বেয়ারাদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। এখন হরিলালের কথায় ওর ভেতরে গভীর বেদনা জাগে। হরিলালকে হিংসে হয়।

—কি যেন জায়গাটা?

—বাগনান হয়ে যেতে হয়। যাবেন? আসুন এই রোববার। ধান জমি কিনেছি চার বিঘে। পুকুরের মাছও খাইয়ে দেব।

—ওগুলো কি?

—বই, ছেলেদের একটা ইস্কুল। রোববারে এলে আপনার হাত দিয়েই প্রাইজটা দেওয়াব।

—ঠিক আছে। ট্রেন বলে দাও, লিখে নিই, যাব। ঠিক যাব। দেখো।

—আমি স্টেশনে থাকব।

চট ক'রে ওর মনে আসে আশ্চর্য আনন্দ। আনন্দে বিভোর হয়ে ও বাড়ি ফেরে, স্ত্রী বলে, এই রবিবারে বাড়ি থেকো। দাদারা, দিদিরা সবাই আসছেন।

—কেন?

—তাঁরাই বলবেন।

—এই রবিবার আমি কলকাতার বাইরে যাব।

—কোথায়?

—বাগনানে।

—কেন?

—আমার পুরনো আপিসের বেয়ারার গ্রামে।

—ও, নো!

স্ত্রী চেঁচিয়ে ওঠে ও চকিতে মাথায় হাত দেয়। যেন মাথায় গুলি খেয়েছে। তারপর দেখা যায়, হাত দেওয়াটি ফল্‌স খোঁপার স্থানচ্যুতি আটকাবার কারণে। ও রেগে ওঠে। বলে, কেন?—দিস্ য়ু কান্‌ট ডু।

—তুমি অস্‌লো থেকে দীঘা যেখানে খুশি যেতে পার, আমি বাগনান যেতে পারি না?

—বেয়ারার বাড়ী।

—বেয়ারা রীতিমতো চাষী গেরস্ত। বেয়ারা শুনেই মূর্ছা গেলে? ভোট দেবার সময়ে তো লেফটিস্ট সব। হরিলালকে আমি কথা দিয়েছি।

রবিবার ভোরেই ও বেরোয় এবং বাগনানে পৌঁছে হরিলালকে দেখে হালে পানি পায়। বাসে ওর গ্রামে। পরিচ্ছন্ন বাড়ি টিনের চাল ও ইটের গাঁথনি। পুকুরে তেল মেখে স্নান। টাটকা মাছ ও ভাত। নিশ্চিন্ত ঘুম। বিকেলে স্কুলে প্রাইজ বিতরণ। একটি আশ্চর্য দিন। স্কুল লাইব্রেরিতে কুড়ি টাকা দিয়ে, হরিলালের বাড়ির গাছের সজনেডাঁটা ও পেঁপে নিয়ে ও ট্রেনে চেপে বসে।

হরিলালকে বলে, আমি সিরিয়াস। একটা জমি দেখে রাখো। এখানেই থেকে যাব।

বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে হরিলাল হাসে। বলে, শীতে আসবেন। নতুন গুড় খাওয়াব।

বাড়ি ফিরে দেখে বসার ঘরে এখন আলো এবং সবাই ওর দিকে কঠিন চোখে তাকায়। ওর হাতের সজনে ডাঁটার বোঝা খুব অবাস্তব

দেখায় এ পরিবেশে। বাঁকুড়ার পোড়ামাটির রাক্ষুসে ঘোড়াটার চোখেও অবিশ্বাস।

দাদা বলেন, তুমি আজকেও...?

—বাগনান গেছলাম। এই তো, হরিলাল ডাঁটা দিল, সত্যি বলছি।

স্ত্রী চেঁচিয়ে ওঠে হিষ্টিরিয়ায়, বাগনানে! সজনে ডাঁটা তুমি কিনে এনেছ। সারাদিন কোথায় বদমাসি ক'রে...।

—না।

—বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস করতে হবে।

বড়দি বলেন, তুই কোন নরকে চলে যাচ্ছিস নিজেই জানিস না।

স্ত্রী ফুঁসে বলেন, ওসব হল অ্যালকোহলিক কানিং। অ্যালকোহলিক মানেই কানিং হয়।

ও ক্ষেপে যায়। ভয়ে মরিয়া হয়। হঠাৎ, খুব রুক্ষ ভাষায় বলে তোমরা দয়া ক'রে চলে যাবে? সাতদিন আমাদের খোঁজখবর না নিয়ে শান্তিতে থাকতে দেবে? আমি একটা এধার-ওধার করতে চাই প্লিজ চলে যাও।

স্ত্রী হিস্টিরিয়ায় চেঁচায়। ও স্ত্রীর হাত শক্ত ক'রে ধরে রাখে। বলে লেট দেম গো।

—না।

—হ্যাঁ।

স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে যায় ও। বলে, এ রকম কোরো না। এতে আমাকে তুমি মেরে ফেলছ।

—আমি তোমায় ভালোবাসি।

—সে ভালোবাসা আমায় বাঁচাচ্ছে না।

—তুমি বোতলের চাকর হয়েছে।

—না। আমি ফিরে আসব।

—বড়দা তোমায় নিজের অফিসে নিতে চান। সেই কথা বলতেই এসেছিলেন।

—আমাকে সময় দাও।

—এই অফিসে তোমার যে বদনাম হয়েছে···

—সময় দাও।

—হাত ছাড়ো।

—না। কাছে থাকো। আমায় ধরে রাখ।

—বহুকাল বাদে ওরা পরস্পরের কাছে আসে। স্ত্রী বলে, য়ু স্মেল ফানি।

—সরষের তেল মেখেছিলাম।

—নতুন কাজ, নতুন পরিবেশ, আমি কাজ ছেড়ে দিতে পারি তোমার পাঁচ হাজারে উই ক্যান হ্যাভ এ চাইল্ড।

—কাজ তোমাকে ছাড়তেই হবে।

—তাই বুঝি ?

—তোমার বলার কথা এইটে তাহলে, দাদার অফিসে আমি, এবং পাঁচ হাজার টাকা···

—কাম্ অ্যালাওয়েন্স।

—সে আমি জানি, কোন্ টাকা স্যালারি হেডে দেখাবে, কোন্ টাকা আনঅডিটেড হেডে দেখাবে।

—সবাই করে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা, এবং আমরা বাবা-মা হতে পারি।

—আরো বড় ফ্ল্যাট। এই চারটে ঘরের ফ্ল্যাটে বাচ্চা···ভাবলেই আমার ক্র্যাম্প্ড লাগে।

—চোদ্দশো স্কোয়্যার ফুটের অনেক কম জায়গায় লোকের বাচ্চা হয়, থাকে, আমরাও ছিলাম।

—যেহেতু তুমি তোমার বাবা নও, ওসব কথা বলে লাভ কি ?

তিনি কি ঘড়িজুতো বেচে মদ খেতেন ?

—কথাটি স্ত্রী বিনা ক্রোধেই বলে এবং ও বোঝে, স্ত্রী বিশ্বাস করে ও ঘড়ি জুতো বেচে মদ খেয়েছে। ও আজ অন্যত্র মদ খেয়ে কাটিয়েছে। হরিলালের গাছের সজনে ডাঁটাগুলির কাছে ক্ষমা চায় ও এবং ঠিক করে সকালেই জমাদারকে ওগুলি দিয়ে দেবে।

—আমাকে ভাবতে দাও।—ও আস্তে বলে।

—যদিচ ও সকলকে আসতে বারণ করে, তবু ও যে নিমরাজি, সে কথাটি স্ত্রী টেলিফোনে সকলকে জানায় এবং বিকেলে বাড়ি ফিরে ও দেখে ওর রুপোলি চুল, অভিজাত-দর্শন বড়দা বসে পাইপ খাচ্ছেন। ওকে সাদরে পাশে বসান উনি। যেন গতকাল কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি, তেমন সস্নেহে বলেন, এই সব চেয়ে ভালো সলিউশন। অন্য চাকরি, অন্য বাড়ি, এ চাইল্ড, ড্রিংকিং প্রবলেম চলে যাবে। আপ্‌সে।

ও খুবই ত্রাসিত বোধ করে। দাদাদের কাছে ও অবাঞ্ছিত এক উপস্থিতি, তা ও বোঝে ও মেনে নেয়। ওর সর্বদা ইচ্ছে থাকে, ওর অসভ্য আচরণের কথা ওরা জানুক। বিব্রত হোক। ওদের সুখী-অস্তিত্বের চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে ওরা বিপন্ন আজ। অরাজনীতিক সাধারণ মানুষ। অন্যদের সুখে রাখতে গিয়ে।

কিন্তু দাদাদের ক্ষমা ও স্নেহ কেন ? সে তো নোংরা। অসভ্য, সিধে নিচে নামছে। ওর সঙ্গে থেকে, ওকে ভালোবেসে একটি মোহনীয়া, অপরূপা মেয়ে প্রত্যহ কালচার্ড মুক্তোর মতো দামী চোখের জল ফেলে।

ও বলে, সব করব।

—করবি ?

'তুই' কথাটি বড় ভয়ংকর। ওকে বিদ্ধ করে। ও তো এদের ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে ও এরা-আছে-জেনে নিশ্চিন্ত থাকতে চেয়েছিল। 'তুই' বলতেন মা ও বাবা। কাকিমা ছাড়া এখন কেউ

ওকে 'তুই' বলে না চট ক'রে। কাকিমা 'তুই' বলার সুযোগ কমই পান। নিরুপায়, মেরুদণ্ডে টি বি-গ্রস্ত শয্যাশায়ী কাকিমা।

—ভেবে দেখব।—ও আবার বলে।

—হ্যাঁ। জানি য়ু আর ম্যান এনাফ।

ইংরেজি বলার সুবিধে হল, তুই-তুমি-আপনি কি বলা হল তা বুঝে নিতে হয়।

ও বোঝে, ব্যবস্থা ওকে করতেই হবে। দাদার কথায় রাজি হলে জীবনটা একটা অ্যারেন্জমেন্ট হতে পারে। দাদাদের, দিদিদের মতো। কাকিমা তো বদলাননি? কাকা এত ওপরে ওঠার আগে যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন। এখনো দেখা হলে কাকিমা মা-বাবার জন্যে চোখের জল ফেলেন।

পরদিন ও আপিসে যায় ও প্রয়োজনীয় কাজটি করে। বিপন্ন হয়ে। আপিসে সবাই খুব স্বস্তি পায়। ম্যানেজার বলেন, ভেবে দেখলে পারতেন। ও বলে, ভেবে দেখেছি।—প্রভিডেন্ট ফান্ড পেতে দেরি হবে।—কত?—দু'মাস।

—বেশ।

কলিগদের আন্তরিক সহানুভূতি।—কি করবে?

—সামথিং।—কি?

ও খুব হেসে বলে, ঠিক করেছি, বাগনানের কাছে একটা গ্রামে গিয়ে চাষবাস করব।

সবাই এ কথাটিকে বিশাল তামাশা মনে করে ও বিভিন্ন স্বরগ্রামের হাসিতে বিগলিত হয়। দ্বিতীয়বার কেনা ঘড়িটা ও নিজের বেয়ারাকে দিয়ে দেয়। ওর টাইপিস্ট ছেলেটিকে দেয় ওর দামী কলমটি। বেয়ারা ও টাইপিস্ট ছেলেটিকে অভিভূত ক'রে রেখে ও বেরিয়ে আসে। কাকার বাড়ি। ঠিক দুপুরে বাড়ি খালি। কাকিমা ওকে দেখে কাছে আসতে বলেন। কাছে বসে ও কাকিমার বুকে মাথা রাখে। মৃত্যুর গন্ধ, মৃত্যুর গন্ধ।

—ঠিক দুপুরে এলি ?

—নইলে তোমাকে একা পাই না।

—কিছু খাবি ?

—না।

—বোস্ এখানে। কাছে আয়। রোগা হয়ে গেছিস কেন ?

—কোথায় রোগা হলাম ?

—হ্যাঁ রে, ওরা যে বলে···

—কাঁদছ তুমি ?

—তুই নাকি খুব খারাপ হয়ে গেছিস ? আমি তো বিশ্বাসই করি না, তবু ওরা বলে।

—সব ঠিক হয়ে যাবে কাকিমা।

—তুই যদি আমাকে নিয়ে যেতিস।

—কাকিমা, শোনো।

—বল্।

—আমি কাজ ছেড়ে দিলাম। ছেড়ে দিলাম কাকিমা। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা নিয়ে গ্রামে থাকব। গ্রামে একটা বাড়ি করব, ফার্মিং।

—পারবি ?

—পারব।

—বউ যাবে ?

—নিশ্চয়ই।

—তবে তো খুব ভালো। তখন তো এত পয়সা ছিল না কারো। ভাসুর ঠাকুর বলতেন, কাছাকাছি ধানজমি কিনব। আমাকে নিয়ে যাস। ঝি-নার্সের হাতেই তো পড়ে থাকি। কেউ কাছে এসে বসে না। সবাই ব্যস্ত, সর্বদা ব্যস্ত।

—আমি তোমায় নিয়ে যাব। তুমি শুধু কাকাকে বলবে, এ নিয়ে যেন রাগারাগি না করেন।

রুনকি বোঝে নি। ও সব ঠিক ক'রে ফেলছে, মানে কাজ ছেড়ে

দেওয়া, এবং নতুন কাজে বহাল না হয়ে গ্রামে গিয়ে চাসবাস করা, —এতেই রুনকির মন ভেঙে যায়। প্রজ্বলন্ত প্রেম ও সতীত্বে সে বলে, যেদিন মানুষের মতো মানুষ হবে, সেদিন আমাকে ডেকো। কাজ ছাড়ব না। এই ফ্ল্যাট আমি একাই রাখব। তোমার জন্যে অপেক্ষাও করব। কিন্তু ওই হতভাগা জীবনে যাব না।

সবাই ছুটে আসে। কথাবার্তায় ঝড় বয়ে যায়। অবশেষে কাকা বলেন টাকা রুনকির। ওর জীবন তুমি নষ্ট করেছ।

—আপনি রাখুন।

ফসফস ক'রে ও কাকার নামে অথরাইজেশন চিঠি লেখে। বলে, আমি কিছু টাকা নেব। আমি যা বলেছি তা করব।

স্ত্রী বলে, অ্যান্‌ড টেক ইওর ডার্টি মানি। তোমারি দরকার হবে। আমি ম্যানেজ করব।

—তুমি আসবে না? আমি যদি পারি সব ইচ্ছেমতো করতে? তবু আসবে না?

—তুমি পাগল হয়ে গিয়েছ।

—তুমি একা থাকবে?

—নিশ্চয় ডিভোর্স করব না।

দাদারা ও দিদিরা বলে, আমরা আছি।

না, ও কিছুই পারে নি। রুনকি সঙ্গে থাকবে না জেনে ওর মনে কিছু একটা কাচের মতো ভেঙে যায়। গ্রামে যায় ও, এবং পালিয়ে আসে। কাকিমা জোর ক'রে টাকা দেওয়ান কাকাকে দিয়ে। স্ত্রীকে বলেন, যা হয়েছে ভুলে যাও। কিছুদিন ওকে কাছে রাখ। ও ঠিক কাজ খুঁজে নেবে। ভুল ক'রে ফেলেছে।

স্বভাবতই স্ত্রী কাকিমার কথা শোনে না। ওকে বলে টাকা আছে, নাও, হোটেলে থাক।

শেয়ালদা'র হোটেল। আবার কাজের খোঁজ। অবশেষে একদিন এক কাজ-পাইয়ে-দেব টাউটের সঙ্গে চোলাইয়ের ঠেক। এক নম্বরি

চোলাইয়ের গন্ধ ওকে অধিকার করে ও আত্মসমর্পণে অশেষ আনন্দ পায় ও। সেই একই প্যাটার্ন। মদ খাওয়া এবং অসভ্যতা ক'রে মার আমন্ত্রণ করা। মাঝে মাঝে রুনকির কাছে যাবার চেষ্টা করা ও বিতাড়িত হওয়া। কাকার কাছ থেকে মাঝে মাঝে একশো টাকা আনা ভিক্ষার মতো। এবং চোলাইয়ের ঠেকের ভেতরে ও বাইরে একেবারে নিজের মনের মতো মানুষদের জগৎ খুঁজে পাওয়া দশ বছর হল।

মাসি ও মেসোর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সমস্ত অতীত ঘুরে ফিরে এল মনে। মাসি বলছে, বিয়ে কর।

এখন বিগত জীবন অন্য কারো অতীত। ওর নয়। ও মাথা হেলালো। খুব পারবে ও। কাকিমাও নেই। এখন ও বহুজনের কাছে এমন এক সত্তা, যে ওর বিলোপে কারো এসে যাবে না কিছু। যখন ও মাঝে মাঝে যায়, ওদের চোখে ও সেই খবরই পড়েছে। রুনকির সিঁদুর পরে অপেক্ষা ক'রে থাকাটা একটা ক্রুশ। ওকেই বইতে হবে। কিন্তু রুনকির স্মৃতিতেও এখন আর বুক ভেঙে যায় না। ভালোবাসাও এতদিনে মৃত।

এদের কাছেই থাকবে ও। যেখানে সম্মান আছে, ভালোবাসা আছে। কলকাতা যাবেই না। কালীঘাটে গঙ্গার ঘাটে যে বুড়োটা বসে থাকে, তাকে একটা চশমা করিয়ে দেবার কথা ছিল। গঙ্গায় যে যা ফেলে, ওই প্রায়ান্ধ বুড়ো চতুর জলশিকারীর কৌশলে তা তুলে নেয়। স্টেশন ওভারব্রিজের আগে কালীঘাটে কার্তিক ঘাটে থাকত। নিজের জুতো মাথায় দিয়ে। তখনি কাকা ও দাদাদের দেখে ঘাটে আসতে। দাদা ঘাটে বসে নাম বলে পিণ্ড দিল। ওর দিকে কেউ তাকায় নি বা চেনে নি। 'প্রেত প্রীতিলতা দেব্যা' শুনে ও বোঝে কাকিমা নেই। সেদিনই আবার ভীষণ গণ্ডগোল বাধায় ও মদ খেয়ে রোখা পাঞ্জাবি ট্রাক-ড্রাইভার ওকে মেরে ফেলত। ভিখিরিরা বাঁচায়। তারপর প্রায়ান্ধ বুড়োর নির্দেশে ওভারব্রিজ। শেষ যেবার গিয়েছিল,

কাকা বলেন, তোমার পঁচিশ হাজারের বাকি বারো হাজারটা নিয়ে যাও। এখানে আর এস না। ওই জামাকাপড়!

যেহেতু ও এখন বর্তমান জীবনে অভ্যস্ত, সেহেতু ভেবে পায় নি, বাসনওয়ালির কাছে কেনা শার্ট ও প্যাণ্ট মন্দ কিসে।

—কোথায় রাখব?

—তুমি এস না।

—চুরি হয়ে যাবে।

—কোথায় থাক?

—ওভারব্রিজে।

কাকার মুখ লাল হয়ে যায়। বলেন, কোনো ভদ্র চেহারার লোককে পাঠিও।

—কাকিমা কবে মারা গেল?

—তাঁর নাম কোরো না। স্কাউন্‌ড্রেল! তোমার নাম ক'রে তিনি···এই যে টাকার ভার নিয়ে আজও দিচ্ছি, সে শুধু তাঁর কথায়।

—আমায় খুব ভালবাসত।

—খুব।

—রুনকিকে দিয়ে দিতে পারেন।

—ওর নাম কোরো না। ও গডেস্‌।

ওর হঠাৎ মনে হয়। রুনকিকে সবাই মিলে মহৎ ও আত্মত্যাগী, স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত, ইত্যাদি শব্দগুচ্ছের ড্রাগ করেছে। রুনকিও তাতে ভজে গেছে। 'গডেস্‌'! হায়, ঝকঝকে সুপ্রতিষ্ঠ জীবনের মাদকতা কি ক্যানসার? তার মোহেই রুনকি এতগুলো বন্ধ্যা বছর কাটিয়ে দিল? না আশপাশের বন্ধ্যা মানুষগুলির জীবনই ওর কাছে মনে হল সব চেয়ে ভালো? রুনকি গডেস্‌! সব দেবীরাই একদিন মানবী হবার জন্যে কাঁদে এবং বেদী থেকে নামতে পারে না। ওর মনে হল, কাকাই যেহেতু পরিবারের তাপশক্তির আদি জেনারেটর ওঁর প্রভাবও কম দামী নয় এই সুবিশাল বন্ধ্যাত্বের জন্যে। কাকার

স্ত্রী শেষ পঁচিশ বছর শয্যাশায়ী রইলেন, মেরুদণ্ডে যক্ষ্মা। কাকার শরীর ও স্বাস্থ্য এখনো বাঘের মতো। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ব্যাকগ্রাউণ্ডে অর্জিত মূল্যবোধের কারণে উনি মাংসের ক্ষুধার জান্তব সমস্যাটির সমাধান খুঁজে পেলেন না, সমস্ত উদ্যম নিয়োগ করলেন চায়ের ব্যবসায়। দাদাদের, দিদিদের, কারো কারো জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিঃশেষিত। উচ্চবিত্ত বাইরে, ভেতরে নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও মূল্যবোধ, স্ক্যান্ডালে ভয়, অতএব পরিণাম, বন্ধ্যা নিষ্ফলতা টেনে চলা। রুনকিও তাতে ভজে গেল?

এখন ও জানে, সব চেয়ে আনন্দ বেঁচে থাকায়, এবং রুনকির জন্যে দুঃখ হয় ওর। সেদিনই ও কাঙালীকে বলে, জামা প্যাণ্ট ফর্সা কোথায় পাই বলতো?

—কেন, গুরু?

—বউদির কাছে যাব।

—আই বাস্।

—যা ভেবেছিস, তা নয়।

—ডাকে নি?

—না।

—গুরু!

—কি?

—তোমার তো সবই আছে।

—ফজুল কথা ছাড়্।

কাঙালী ওকে যাদবপুর স্টেশনে নিয়ে যায়। স্টেশনের গায়ে বুড়ো হোসেন ভেণ্ডার ও রিক্শাওয়ালাদের, শীতার্ত ভিখিরিদের জন্যে ফোর্থ হ্যাণ্ড জামাকাপড় নিয়ে বসে। শার্ট ও প্যাণ্ট কেনা হয় চার টাকায়। অসীম মমতায় হোসেন বলে, আছড়ে কেচো নি বাপ। তুস্থু তুস্থু ক'রে কেচো।

কাঙালী বাড়ি থেকে তা ধুয়ে এনে দেয়, এবং ইস্ত্রি করে। সেলুনে

চুল কেটে, দাড়ি কামিয়ে, দু'টাকার হাওয়াই পরে ও রুনকির সঙ্গে দেখা করতে যায়। পুরনো বাড়ি।

পুরনো বাড়ি, সাজসজ্জা নতুন। সর্বত্র ধূপের গন্ধ এবং দেওয়ালে সাঁইবাবার উদ্দীপিত মুখ। ভক্তিভরে নিজেকে নিবেদন করলে যেন উনি যে কোনো সময়ে ভস্ম অথবা মধু অথবা ঘি ঢেলে দেবেন। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে। খুব অসম্ভব লাগে ওর সবকিছু। ও তো নো গুড, বরবাদ, ভাসন্ত শ্যাওলা। রুনকি কেন সব মিথ্যে জিনিসে শরণ খুঁজছে?

দিনের মডেল কুইন রুনকি সন্ধ্যায় সাদা জর্জেটে রুক্ষ চুলে কপালে চন্দন পরে ব্রতচারিণীর ভূমিকায় ঘরে ঢোকে, সঙ্গে দু'টি লা-মার্টিনিয়ের মার্কা বালকবালিকা নিয়ে। ওকে দেখে রুনকি কাতর হাসে বিস্ময়ে ও শিশুদের বলে, তোমরা ও ঘরে গিয়ে পড়ু-পড়ু করো কেমন?

ওরা এক সঙ্গে, 'হ্যাঁ মা সোনা' বলে নিষ্ক্রান্ত হয়। দৃশ্যটি অত্যন্ত তামাশার। ও বলে, ওরা কারা? তোমাকে 'মা সোনা' বলছে?

—ছোড়দির মেয়ে, ছোড়দার ছেলে, বাড়ির বাচ্চারা তো এখন এখানেই থাকে। আমার ভাইয়ের বাচ্চারাও। তারপর তুমি?

—ওর বক্তব্যের খেই হারিয়ে যেতে থাকে। হতাশা। গভীর হতাশা রুনকি সিন্‌থেটিক না হয়ে সাঁইবাবার চরণাশ্রিতা। দিনে উদ্ধত শিফনে মডেল। স্বামী নো-গুড যার, সে এভাবে সিন্‌থেটিক উপায়ে, সাঁইবাবা ও অন্যদের ছেলেপুলের মারফৎ জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ করছে কেন? কেন সরাসরি জীবনের যন্ত্রণার অন্ধকার ও আলোকিত স্বাদ নিচ্ছে না? ও বোঝে, রুনকির চারদিকে এখন কাচের দেওয়াল। খুব স্বাভাবিক ও সত্য কথা বলে ওকে ছোঁয়া যাবে না। বেচারি রুনকি। কিন্তু যা বলবার এখনি বলতে হবে। সময় নেই।

—রুনকি।

—বল।

—আমার ওপর ভরসা রাখা তো নিরর্থক। তুমি ডিভোর্স কর

আমাকে। আমি করতে পারি। টাকা নেই। ডিভোর্স কর, সুস্থ-ভাবে বাঁচো। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কিছু টাকা কাকার কাছেই আছে। তুমি চাইলে তা নাও। আমাকে উনি, তোমাকে ডিভোর্স করার কথা বললেও মাসে একশো টাকার বেশি দেবেন না।

—এই কথা?

রুনকি আলোচনায় পর্দা টেনে দেয়।

—রুনকি, তুমি নিজেকে মেরে ফেলছ।

—ডিভোর্স আমি করব না।

—এ যে ভীষণ ফাঁকা জীবন, রুনকি?

—তোমার কাছে তাই মনে হবে।

—ফাঁকা নয়?

—না। আমার কাজ আছে। বাড়িতে বাচ্চারা আছে। তোমার কাকা, দাদারা, দিদিরা আছেন। অ্যান্ড আই হ্যাভ হিম!

রুনকি সাঁইবাবার দিকে তাকায়।

—কিন্তু···কিন্তু···আমার কারণে এভাবে থাকলে আমার ওপর তুমি পাপবোধের বোঝা চাপিয়ে দেবে। তুমি নিশ্চয়ই চাও না আমি ফিরে আসি?

—তাই চাই। কিন্তু এই 'তুমি' নয়। যেভাবে কাম ব্যাক করলে আমার কথা থাকে, সেই 'তুমি'।

—রুনকি, আমি রাস্তায় থাকি, পথে বসে খাই, মদের ঠেকে··· আজ আমার পক্ষে কাজ পাওয়া, এমন কি একশো টাকার চাকরিও কেউ দেবে না।

—ওটা তোমার তৈরি সমস্যা। আমার কথা তো কখনোই ভাব নি, হঠাৎ আজ এসব কথা বলে লাভ নেই। জানো, তোমার দাদারা আমায় 'ছোট্ট মা' বলেন? ছোট্ট মা?

—রুনকি, স্ক্যানডালের ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি, ডিভোর্স কর, বিয়ে কর কাউকে, মা হও।

—ছিঃ!

রুনকি জ্বলে ওঠে। পুরনো আগুনে। বলে, আমি ওসব নোংরা কথা শুনব না।

—এগুলো নোংরা কথা নয়।

—খুব নোংরা। তুমি চলে যাও।

—শুনলে পারতে।

—না। আর যেখানে থাকো, সেখানে গিয়ে এ কথা মনে ক'রে কষ্ট পাও, তোমার জন্যে আমার এই প্রতীক্ষা।

—রুনকি জীবনটা কি সিনেমা, না উপন্যাস? বি রিয়্যাল। এ তুমি ঠিক করছ না।

—তুমি যাও।

মাথা নাড়ে ও, বেরিয়ে আসে। ঘুরতে ঘুরতে কাঙালীর কাছে। বলে, নাঃ ভালো কথা শুনল না। এখন কি যে করি।

—কি বলতে গিছলে?

—দাঁড়া, ভাবি।

ভেবে ভেবে কুল পায় না ও। রুনকির বন্ধ্যাজীবন ওকে পাপবোধে লিপ্ত করে। আজ ভীষণ মদ খায় ও। বিশাল সুপারম্যান হয় ও, ম্যানড্রেক, অরণ্যদেব, লোথার। ফলে ঠেক-এর পৃষ্ঠপোষক আঞ্চলিক মস্তান অ্যালবার্ট ওকে ঘেঁটি ধরে আছড়ে ফেলে বাইরে। মাথা ফেটে যায়। লাথি পড়ে মুখে ও গায়ে। না-না-না বলতে বলতে ও গড়াতে থাকে। লাথি। না, আর মেরো না। লাথি। গলগল ক'রে রক্ত বমি করে ও। শোনে—শালা! লাইনে পেতে দেব।

—ইয়েস! ডু। রুনকি বেঁচে যাবে।

—শালা ইংরিজি বলছে।

লাথি। অন্ধকার।

কাঙালীরা ছুটে এসেছিল। অ্যালবার্ট ও কাঙালীদের মধ্যে মারামারি। সোডার বোতল ভাঙে। দোকানপাট ঝপাঝপ বন্ধ।

কাঙালীর দাদা হারু চেঁচাচ্ছে, অ্যালবার্ট! হারামি! লাইনে লাশ আমিও পাততে জানি। পয়সা দিয়ে মদ খায়। বড় ঘরের ছেলে। দিলদার মানুষ। তাকে মেরেছিস? শালা যার পয়সার অ্যাদ্দিন খেয়েছ মাল?

পুলিশভ্যান আসে। হাসপাতাল। পাঁজরার হাড় ভাঙা, গোড়ালির। মাথায় চোট। জীবন ও মৃত্যুর সন্ধি সীমায় ও। কাঙালীদের প্রবল চাপ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ওপর—আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছি।—অবস্থা কি রকম?—বলা যায় না। ওঁর কেউ নেই?—বাঁচিয়ে দিন।

ওর চেতনায় সব অন্ধকার। বাবা, মা। কাকিমা। ঘাটে বসে, ধুতি পরায় অনভ্যস্ত বড়দা কাকিমাকে ঘাটপিণ্ডি দিচ্ছে। একফোঁটা দুধ দিয়ে বলছে, তোমার যাত্রার পথ ক্ষীর ও মধুময় হোক। মেজদা শ্রাদ্ধাধিকার নিচ্ছে বড়দার হাত থেকে। ওভারল্যাপ ক'রে সেইসময় উচ্চারিত প্রায়ান্ধ বুড়োর কথা, এরা বড়লোক, কিন্তু ঘাটে বসে তিন পয়সায় কাজ সারবে দেখো গুরু।—বুড়োকে চশমা ক'রে দিতে হবে।

ডাক্তারদের বিস্মিত ক'রে ও সেরে ওঠে। বেরিয়ে এলে কাঙালী ওকে নিজের বাড়ি নিয়ে যায়। ও বলে, দুটো ভাত এনে দিবি, কাগজে ক'রে? রকে বসে খাব?

—না গুরু, বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে নাইবে, খাবে।

—তোর মা আছেন না?

—মাকে বলিছি।

পানের দোকানের লাগাও খুপরি ঘর। পাঁচ ভাড়াটের কল-পায়খানা। স্নান ক'রে ও ভাত খায় একমাত্র ঘরে বসে। কাঙালীর মা বলে, আমার ছেলেদেরকে তুমি কত ভালবাস। আগেকার ভালো জামা-পেন্টুল দিছলে। ওরা এখনো পরছে। ভোঁদার মায়ের অসুক গু-মুতে মাকামাকি, কোলে ক'রে রেকশায় তুললে, হাসপাতালে নিলে। তোমার কেন এত ভোগান্তি বাপ?

খেয়েদেয়ে ও এখানেই ঘুমোয়। বিকেলে চা খায়। হারু বলে, আজ ঠেকে যেও না গুরু। তোমার সঙ্গে কতা আচে। অ্যালবার্টের সাতে আমরা মিউচুয়াল ক'রে নিয়েচি। কিন্তু ও বেজায় হারামি। কবে কি ক'রে বসবে!

—তোরা তো থাকিস।

—যেও না। তোমার ব্যবস্তা করিচি।

—কোথায়?

—এক জায়গায়। ঠেকে গেলেই তুমি মদ গিলবে, মারতে যাবে, মার খাবে।

—তোরা যা বলবি তাই করব।

পরদিনই কাঙালী ওকে ডায়মণ্ডহারবারে আনে। মাসির বাড়ি।

॥ দুই ॥

ডায়মণ্ডহারবারে কেটে যায় বহুদিন। একদিনও মদ খাবার ইচ্ছে যায় না ওর। সমস্ত অতীতকে মনে হয় এই বর্তমানের দিকে হাঁটার পথ। কাঙালী এর মধ্যে কাকার কাছ থেকে ওকে টাকা এনে দিয়েছে। টাকা ও মাসির হাতে তুলে দিয়েছে। মাসি ওকে তৃতীয় মাসে একশো টাকা ধার দিয়ে মুড়ির চাল কেনার পুঁজি দিয়েছিল। মাসিই ওকে ব্যবসাটি ক'রে দিয়েছে। চাল কিনতে গ্রামে যায় ও। সুবিধেয় থোড়-কচু-মূলো-শাক-ডাঁটা কিনে ভেণ্ডারদের থাউকো বেচে দেয়। মাসি বলে, এই এগারো মাস তোমার তিনশৎ টাকা জমল। জানলে?

—তুমিই হিসাব রেখ।

—বাবার আমার নেশা ছাড়া চলে নে। মদের নেশা ভুলে গিয়েছে, অন্য নেশা!

—নেশা নয় মাসি, বেঁচে গিয়েছি।

—বলিছিলাম না? গুণীলোক?

—হ্যাঁ।

বিকেল হলেই স্নান ক'রে লুঙি ও গেঞ্জি পরে ও নলিনের কাছে রওনা দেয়। নলিনের কাছে বসলে ও অশেষ শান্তি পায়, ও অন্য এক জগতে প্রবেশ করে। ডাক্তারের ঝকঝকে চেয়ার, হাসপাতাল, নার্সিং-হোম, অজস্র ওষুধ, সব এখানে অজানা।

—অ বাবা।

—বল গো কাতু।

—ছেলে কাঁদে, মোটে থামতে জানে নি। আমি চাল বইব। মহাজনের কাচে ঝাব, টেনে শ্যালদ ঝাব, তা চাল বইব, না ছেলের কান্না থামাব? ল্যাবেনচুষি দিচ্ছি, টেন থেকে প্যায়রা, কাটি ভাজা, নানা নিদি জিনিস। তা থামতে জানে নি? বলি, বাবার চরণ ধরি গে। বাবা হল ভগবান।

—শনিবার ছেলেকে চ্যান কইরে নে এস, শুদ্ধ বস্তরে আসবে, পাঁচটা গোটা হলুদ এনো।

কাতু চলে যায়! ও বলে, ছেলে কাঁদলেও আপনি সারাতে জানেন?

—আর দাদা! এদের হলো অন্ধকারে বাস। রোগ তো সকলি দাদা। কান্নাও রোগ, হাসিও রোগ, বেশি বকলে রোগ, কথা না কইলে রোগ।

—কি ক'রে থামাবেন?

—দেখুন না! আপনিও তো শিকচেন।

শনিবার কাতু তার কাঁদুনে ছেলেকে ট্যাঁকে নিয়ে আসে। ছেলে ভয়ে চোখ খোলে না, মাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। নলিন একটি শিলে হলুদ বাটে। তারপর ভূর্জপত্র বলে যা বের করে, তাকে ব্রাউন পেপার বলেই মনে হয় ওর।

তথাকথিত ভূর্জপত্রে নলিন, হ্যারিকেনের আলোয়, হলুদবাটা গুলে তুলি দিয়ে লেখে, 'সিদ্ধি উলেট্ নরসিংহ বিকটবেশ ওঁ নরসিংহ নরসিংহ ওঁ হ্রীং ক্লৌং ইতি মন্ত্রং!' কাগজটি গুটিয়ে লাল সুতোয় বেঁধে ও এক

ঢ্যাবা মাদুলিতে পোরে। ছেলের হাতে বাঁধে। তারপর বলে, যাও, ছেলে আর কাঁদবে না। আর যদি কাঁদে, নলিন হাড়ি আমি, হেতা রেকে ঝাবে। রাতে মায়ের ডান-ডাকিনি দেখিয়ে দেব, কান্না ভুলে যাবে।

কানু মহা আশ্বাসে চলে যায়, ও যাবার সময়ে বলে, বাবার আমার সদাবের্‌তো। নিতে ঝান নি। মেয়ে বলে চাট্টি মুড়ি আর ছাতু দে গেলাম। খেও।

ও বলে, সত্যি, আপনি এদের আপদে-বিপদে যা করেন! নেন না কেন কিছু?

নলিন বলে, নিতে নেই দাদা। গুরুর নিষেদ। তা বাদে যে বেটা দেয়, সে তকনি ভাবে দামের যুগ্যি জিনিস পেলুম কি?

—আপনার পেট চলবে কি ক'রে তা তো ভাববেন।

—চলে কি আর যায় নে? আচি তো বেঁচে।

—পাঁচজনের বুদ্ধি আছে। আপনার কথা শুনে পয়সা দেয় না তবে এটা-ওটা দেয়।

নলিন গভীর আত্মপ্রসাদে হাসে। বলে, ডায়মণ্ডহারবারের মানুষ ছেদ্দাভক্তি জানে। কেউ কোন সামিগ্‌গি না দিয়ে খায় নে।

—এবার গল্প বলুন।

—চা আনি তবে?

দোকান থেকে চা আনে নলিন। হুশ্‌হুশ্‌ ক'রে চেটেপুটে চা খেয়ে বলে, দাদা! গ্যাজা টানি তবে ওই যে চাটুকু খাই, তার শক্তি কত।

দু'জনে দু'টি বিড়ি ধরায়। ও চিত হয়ে শুয়ে পড়ে। নলিন বলে, জানি না কি? সেবার হলধর সাঁপুই বললে, জেয়াতি ভাইকে প্রাণে মেরে দাও। আমি বলি, মারণ মন্তর ঝানলেও প্রাণে মাত্তে নি, শত্রু নিপাতন ঝানলেও কত্তে নি। ভালো করো, মন্দ কোর না। তা ওই যে ক্যাঙালীর মাসি, ওর সোয়ামি ছিল বারমুকো। সে অবোলা

মেয়েছেলে, কেঁদে কেঁদে বেড়াত। তা আমি বন্নু, মা! পতি বশী-করণের এত মন্তর থাকতে কেঁদে বা বেড়াচ্ছো কেন? তখন ও বললে···

নলিনের কথা বলার ভঙ্গিটি ভারি শান্ত। খুব রোমাঞ্চকর বা উত্তেজক কাহিনী বলার সময়েও ওর গলা এক শান্ত স্বরগ্রামে বাঁধা থাকে। দার্শনিক নলিন। ও যেন জেনে গেছে, কোনো ঘটনাই এমন উত্তেজক বা রোমাঞ্চকর নয় যে অন্তরের অন্তরকে তা বিচলিত করবে। কোনো ঘটনাকেই অতখানি গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়। সাধারণ নলিনের পক্ষে। তাকে তো ছেঁড়া তোষকে কালো মশারি টাঙিয়ে শুতে হবে পোস্তবাটা দিয়ে পন্তি ভাত খেয়ে, মুকাবিলা করতে হবে আগামী কালের অন্ন চিন্তার সঙ্গে।

নলিন বলে, কাঁউর-কামিখ্যেতে নয়, বিপদে পড়িছিলাম জলপাই-গুড়ির জঙ্গলে। এক ডাকিনীসিদ্ধ তান্ত্রিক, শুনচেন দাদা?

—শুনছি।

—সে বলে, মেয়েছেলেকে বশ ক'রে নে দাও। নইলে তোমায় মেরে ফেলব। সে মেয়েছেলে এক ভরা যুবতী, বুঝলে? তা মেয়ে-ছেলে বশীকরণ কচ্চি বলে স্তম্ভন মন্তরে তারে সেই জঙ্গলেই আটকে রেকে তবে পাইলে বাঁচি।

—ঘুরেছেন খুব?

—খুব ঘুরে নিইচি। কাঁউর-কামিখ্যে, চন্দ্রনাথ, তারাপীঠ, অট্টহাস সব দেখিছি। শেষে ডায়মণ্ডহারবারে এসে থিতু হইচি।

—হলধর সাঁপুইয়ের ছেলে কেন এসেছিল?

—গোবিন্দ?

—হ্যাঁ। চমকালেন যে?

—মুশকিলে পড়িচি দাদা।

—কি হল?

—গোবিন্দটে সাক্ষাৎ গুণ্ডা তো! ওর ট্যাঁক হইছিল কাছুর

বোনঝির 'পরে। সে কি হতে দোয়া ঝায়? বিয়ে হয়েচে, সোয়ামি রেখে গেচে মাসশাউড়ির ঠেঙে, সেই বাদায় গেচে। শেষে তারে নে শউরবাড়ি থুয়ে আসি। সে হতে গোবিন্দর রাগ।

— তারপর?—ও উঠে বসে।

—একন ধরেচে, ইলিশের নৌকো বেরুবে তো? নৌকোস্তম্ভন ক'রে ওর শত্তুর হাসেম আলির নৌকো আটকে দিতে হবে। ইলিশের নৌকোর ওই দু'জন উঠতি মহাজন তো একন! বলে হাসেমের নৌকো মাঝপতে আটকে দাও।

—নৌকো আটকাতে পারেন?

নিরীহ ও ন্যাংটো সজ্জন নলিন বলে, তা কি পারি নে? দেকিয়ে দিতে পারি আশ্চজ্জ সব বিদ্যে। স্তম্ভন বিদ্যেতে সব বন্দ কত্তে পারি। একশোজনের সভায় পুষ্যা নক্ষত্রে যষ্টিমধুর মূল ফেলে দোব, সবাই কতা বন্দ ক'রে পুতুলের মত বসে থাকবে। কিন্তু গুরুর নির্দেশ হচ্ছে, কাজ করবে ভালো উদ্দেশে। মন্দ উদ্দেশে করেচো কি মরেচো। গোবিন্দ কি ভালো উদ্দেশে বলচে?

—না না, দু'জনেই বদমাশ। ইলিশ ওরা বিশ-পঁচিশ টাকা কিলোয় বেচবে বলে আপনি কেন মন্তর পড়তে যাবেন? কক্ষনো যাবেন না।

—আর দাদা! এক লক্ষ বার মন্তর জপ করতে হবে। নইলে ডুমুরের খোঁটা যোগাড় কত্তে হবে ভরণী নক্ষত্রে, নৌকোয় ফেলতে হবে। তাতে নির্ঘাৎ ফল দেবে। সেই ক'রে সোঁদর বনে ডাকাতের নৌকো আটকাতুম। বাঘ-সাপের ভয় করি নি। অন্যাই কাজে কি মন সরে।

—ওরা হামলা করলে আমায় বলবেন।

—দেকি। হতভাগাকে কাটাচ্ছি সমানে।

—আমি আছি, ভয় কি?

নলিন তাতে খুবই ভরসা পায় ও দুর্গন্ধ হাসি বিকিরণ ক'রে বলে

আমার তো আপনি ভরসা। এখানেই ঝকন থিতু হলেন! সংসার করুন।

—আমাকে মেয়ে দেবে কে?

—আচে। সদ্ কায়েতের মেয়ে। বাপ বে দিতে পারে নি মরে গেচে। বয়স বচর তিরিশ। রাঁধবে-বাড়বে, ঘর দেখবে। সংসারে দাদা শান্তিটা বড় দরকার। আমার তো উপায় নি। গুরুকে কতা দিইচি।

—গুরু খুব কড়া?

– বাপ রে! মেয়েছেলে গুরু তো! কামিখ্যেয় বসে সব নখদর্পণে দেকচে। এট্টু কতার বাইরে কাজ কল্লে গাচে চেপে উড়ে চলে আসবে।

—মেয়েছেলে?

—সাক্ষাৎ দেবীর অংশ।

কোনো ব্যত্যয় করে না নলিন। ব্যত্যয় করলে যে গুরু শাস্তি দিতে আসবেন, তিনি নলিনের বিপৎকালে সাহায্যে আসেন না। ও যায় গ্রামে, ফিরে শোনে গোবিন্দ দলবল নিয়ে নলিনকে ধরে নিয়ে গেছে। গোবিন্দকে নলিন না কি বলেছিল, অন্যাই কাজে আমার মন্তর খাটাব নে।

গোবিন্দ বলেছে, হাড়ির পো, তার মুকে এত বড় কতা? শিক্কা দিতে হচ্চে।

টেনে নিয়ে যাবার কালে নলিন নাকি, মেরে ফেলবে, কে আচ বাঁচাও—বলে আর্ত এক চীৎকার করে। চীৎকার শুনেই সভয়ে সকলে ঘরে দোর দেয়, জানালা বন্ধ করে। ওর বুকে সে চীৎকার না শুনেও বিঁধে যায়।

ও বেরোচ্ছে দেখে মাসি বলে, ঝেওনি, অ আমার বাপ, গোবিন্দ সাঁপুয়ের রিষ পল্লে কেউ বাঁচবুনি গো।

—থানায় যাচ্ছি। কিছু হবে না। পুলিশ গিয়ে পড়লে ঠিক ছাড়িয়ে আনা যাবে।

থানা বাবু ওর কথা শুনে, ওর অবস্থান, পরিচয় শুনে ঘোর সন্দেহ চোখে নিয়ে তাকান। ও বলে, শিগগির চলুন।

— আপনি তো চোখে দেখেন নি কিছু ?

—চোখে না দেখলেও ঘটনাটা ঘটেছে। পাড়ায়-বাজারে সবাই জানে।

— আপনার কে হয় নলিন হাড়ি ?

— বন্ধু।

—বন্ধু! চলুন, যাচ্ছি।

কনস্টেবল ও সেপাই নিয়ে উনি বেরোন। লাভ হয় না কিছু। গোবিন্দর বাবা, বাজারের মাছের মহাজন, প্রবল প্রতাপী হলধর সাঁপুই বলে, এ যে গল্পকথা হয়ে গেল ? ইনি বলছেন নলিনকে গোবিন্দ বিকেলা ধরে নে গেচে। গোবিন্দ সকালা বেইরে গেচে নৌকো নে।

এভাবে ছায়াবাজি চলে ও দু'দিন বাদে নদীতটে নলিনের মৃতদেহ মৃদুচ্ছন্দ ঢেউয়ে খেলা করে। মাছ খাবলেখুবলে একাকার চেহারা।

দেখে ওর মাথায় সব গোলমাল হয়ে যায়। ভীষণ, ভীষণ ক্রোধ, আক্ষেপ, ভয়। কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে নি, রুক্ষ কথা কয় নি, নিজের মত নিজে থাকত। সাধ্যমতো দীনদুঃখীকে সাহায্য করত, নিজের ক্ষমতার ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল ওর। ওর দুর্গন্ধ হাসি, চা-টুকু চেটেপুটে খাওয়া, শান্ত গলায় কথা বলা!

মেসোরা লাশঘরে থেকে, পুলিশের হেফাজতি লাশ নেয় এবং বহুজন শবদেহের পেছন পেছন যায়। বাজারের গরিব তরকারিঅলা, চালওয়ালী, মুড়িভাজুনীরা যায় কেঁদে কেঁদে।

ওর মনে প্রতিশোধের প্রজ্বলন্ত অভীপ্সা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো যায় ও আসে, আসে ও যায়। ও কিছু করলে মাসি ও মেসোর জীবন বিপন্ন হবে। কিন্তু শুভেচ্ছা স্থায়ী হয় না ওর, যেদিন বাজারে গোবিন্দকে দেখে ট্রানজিস্টার কানে চেপে মাছঅলার সঙ্গে কথা কইতে। নলিনের মুখ ওকে তাড়া ক'রে আসে ও প্রতিকার চায়।

ও গোবিন্দকে ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দেয় ও মারতে থাকে। ব্যাপারটি অপ্রত্যাশিত ও লোকে কিছুক্ষণ মজা দেখে। তারপর গোবিন্দের অনুচররা পরিস্থিতি টেক্-ওভার করে।

মার, ভীষণ প্রহার। পুলিশ। হাসপাতাল। হাসপাতালে এক রাত। ভোরেই ও হাসপাতাল ছেড়ে পালায়। থাকলে মাসি ও মেসো জড়িয়ে পড়বে। হয়তো না থাকলে ওদের ওপর তেমন জুলুম হবে না। ওদের প্রণাম ক'রে যেতে ইচ্ছে করে। করে না। ট্রেনে চেপে বসে ও ট্রেন ওকে অবশ্যাম্ভাবী অন্ধকারে নিয়ে চলে এই সকালেই। সুখী, নিরুদ্বেগ, শান্ত জীবন পেছনে পড়ে থাকে। চশমা খুলে বার বার চোখ মোছে ও। রুনকিকে ছেড়ে চলে আসতে এর তিলেক কষ্ট হয় নি। সে জীবনে ওর শিকড় ছিল না। এখানে ছিল। নলিন। অক্ষম, অসহায়, নিরুপায় নলিন। নলিনদের কেন গোবিন্দদের হাতে ফেলে আসতে হয়?

কলকাতা। কাঙালীকে ও সবই বলে। সন্ত্রস্ত কাঙালী চলে যায় ডায়মণ্ডহারবার। কাঙালী না ফেরা অব্দি ও স্টেশনে বসে থাকে। মাসির বাড়ি ফেরার আকুল আকাঙ্খা বুকে। ওকে দাগা দিয়ে ডায়মণ্ডহারবারের ডাউন ট্রেন সারা দিন চলে যায়, চলে যায়। কাঙালী বিকেলে ফেরে ও বলে, মেসো বুদ্ধি রাখে। সোজা হাসেমকে যেয়ে সব বলেচে। হাসেম গোবিন্দকে কড়কে দিয়েচে। এখন আর ওকে তিন মাস নড়তে হচ্ছে না গুরু। ওর হাতও ভেঙ্গে দিয়েছ, কানটা সেলাই করে মুড়ো হয়ে গেছে।

—মাসি কি বলল?

—তোমার তরে কেঁদে কেঁদে ভাত খায় নি আজ। বলছে, বাপকে এনে দে। উনি সব বিদ্যেও শিখেচে। আমাদের বল-ভস্‌সা চলে গেল।

ও কেঁদে ফেলে চোখ ফেরায়।

—গুরু?

— বল্?

—যাবে ?

—না কাঙালী। আবার কি থেকে কি হবে।

—মাসি তোমার টাকা যেয়ে আনতে বলল। বলল, তখন হাত জড়িয়ে ধরব।

—দূর! মাসির কাছে কোনো টাকাই নেই আমার।

—চল ?

—কোথায় ?

—আমি-ভানু-নেলো-পটল, যার কাছে খুশি থাকবে। চল।

—নারে, কোথাও যাব না।

—তবে ?

ও হাসে। ওর হাসি কাঙালীর মর্মে বিঁধে যায়। বলে, আমি তোদের বড্ড জ্বালালাম। তাই নয় ?

—না গুরু। বাতেলা মাত্তে জানি না, কথা আসে না। তুমি, তুমি হলে মাথায় রাখার লোক।

—ভালোবাসিস তো, তাই জ্বালালাম। কেউ ভালোবাসে নি, তাদের জ্বালাইনি।

—কি করবে গুরু ?

—এখানেই থাকব। এ মাসের টাকা ?

—তোমায় দোব না গুরু। যা খাবে, যেখানে খাবে খাও। হিসেব মিটিয়ে দোব।

—বেশ। বেশিদিন জ্বালাব না।

কাঙালী আন্তরিক বিশ্বাসে বলে, নলিনকে মেরেছে, গোবিন্দ সাঁপুই মরবে গুরু। এত অধর্ম কি ভগবান সয় ?

নলিনের দেওয়া একটি মাদুলি ও আঙুলে নাড়ে-চাড়ে। তারপর বলে, চ, খেয়ে আসি।

বাজারের লোকেদের ভাত খাবার হোটেলে ও যায়। বারো আনা মিল্। কলাইয়ের থালায় কড়াই ডাল, পুঁইয়ের ঘ্যাঁট ও ভাত

খেতে বমি উঠে আসে। দীর্ঘ দিনের অনভ্যাস। নলিন।

রাতে গিয়ে ও সুপারম্যান হয়। ম্যানড্রেক। অ্যালবার্ট ওকে দেখে যাচ্ছে, মারছে না কেন? ভয় পেয়ে কেঁদে ও ছুটতে থাকে। পড়ে-থাকা ল্যাম্প পোস্ট। হ্যাঁ। গাছ চালানো মন্ত্র। নলিনের কাছে যাবে ও। ফিরে যাবে শান্ত, নিরুদ্বেগ জীবনে। ট্রেনে চেপে নয়। বাস্তব ও অবাস্তবের সীমারেখায় পড়ে-থাকা ওই ল্যাম্প পোস্টে চেপে যাবে।

—কার আজ্ঞে?

—হাড়িঝির আজ্ঞে।

—কার আজ্ঞে?

—কাঁউর-কামিখ্যের আজ্ঞে।

এই রকমই চলতে থাকে, চলতে থাকে। ক্রমে সব কিছুই হয়ে ওঠে এক আশ্চর্য রিচুয়াল। আশ্চর্য এবং আবশ্যিক। গুরুকে নিরাপদ শৈশবে (কেন না নলিন বলেছিল অতীতের যে কোনো ইচ্ছিত সময়ে চলে যেতে পারবে) অথবা নলিনের সঙ্গে-সাহচর্যে, মাসির স্নেহচ্ছায়ে নিয়ে যাবার পক্ষে আবশ্যিক এ রিচুয়াল। চোলাইয়ের দুর্গন্ধে অধিকৃত ও, গুরু, এভরিম্যান। এই গন্ধ অতিক্রম ক'রে ও শৈশবে শিশু-শরীরে সরষে তেলের গন্ধে, বাল্যে কাকিমার তালবড়া ভাজার গন্ধে, যৌবনে চায়ের দোকানে চার্মিনারের গন্ধে, শেষে মাসির বাড়ির মুড়িভাজার পোড়া-পোড়া গন্ধে, নলিনের পায়োরিয়া-গ্রস্ত হাসির দুর্গন্ধে ফিরে যেতে চায়। গন্ধ থেকে গন্ধে উত্তরণ। সেইসব সুস্থ ও স্বাভাবিক গন্ধে উত্তরিত হবার জন্যে প্রথম রিচুয়াল চোলাইয়ের গন্ধের কাছে পরাজয় মানা। ও জানতেও পারে না, ওর কোন পরিণতি ওর আপন-জনেরা আশা ও আশঙ্কা করে। ভাবতেও পারে না, 'চোলাই মদে বিষক্রিয়ার ফলে বহুজনের মৃত্যু' সংবাদ কাগজে পড়লেই তারা শংকিত হয়। কেন না শেষ সাক্ষাৎকারের পর রুনকি অত্যন্ত ভেঙে পড়েছে শরীরে-মনে। দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা-পাঁচিলে ফাটল ধরেছে। খবরটি পড়লেই রুনকি

পাগল হয়ে যায়। সেদিন দোকানে যায় না। দাদাদের বাধ্য করে খবরাখবর নিতে, দেখতে বাধ্য করে বিবর্ণ ও ধূসর শবদেহগুলি। ঠাণ্ডি-ঘরে লেবেল আঁটা শবদেহ দেখার অভিজ্ঞতা দাদাদের সুখী অস্তিত্বে অবক্ষতি ঘটাচ্ছে। এখন ওঁরা বুঝছেন, রুনকিকে বছরের পর বছর মদত দেবার ফলে এই পরিণাম তাঁদের। রুনকি নিজের মতো থেকে যাবে প্রতীক্ষায়—সাঁইবাবাতে—অপরের সন্তানে বন্দী—ওঁরা নিজেদের মতো মদত দিয়ে চলবেন ওকে—যার জন্যে সব কিছু ঘটছে সে কোথাও ওঁদের অজ্ঞাতে নীরবে শেষ হয়ে যাবে – এমনি ভাবে চললে সব সুন্দর ও অটুট থেকে যেত। রুনকির হিষ্টিরিয়া, 'দেখুন ও কি না' তা ঘটতে দেয় না। ফলে ওঁদের মনেও অবক্ষতি ঘটে। ওঁরা নতুন এক উপ-লব্ধিতে পৌঁছন। অনুশোচনা। ওর জন্যে যা করতে পারতাম, তা করি নি। একটু ভালবাসার হাত বাড়ালে ও চোলাইয়ের অন্ধকারে হারিয়ে যেত না।

দ্বিতীয় রিচুয়াল, চোলাইখানায় সুপারম্যান হওয়া, ম্যানড্রেক—লোথার—অরণ্যদেব হওয়া। পাপবোধ। গুড় + পচা ভাতের রস + স্পিরিট + অ্যালকেলির সংমিশ্রণ। তীব্র তীব্র সুরা। ঢক ক'রে কবজির ঝাঁকুনিতে গলায় ঢালা। পাকস্থলি ও গলায় আগুন। পাপ-বোধ চোলাই হয়ে মূর্ত রূপ নিচ্ছে। রুনকির অপচিত জীবনের জন্যে ও দায়ী, এবং নলিনের হত্যার জন্যেও কোনোপ্রকারে। নলিনের সঙ্গে ওর একটা অংশেরও মৃত্যু ঘটেছে, কেন না, ও এভরিম্যান। মাসির ব্যর্থ প্রতীক্ষার বেদনার জন্যেও। কাঙালী কারখানায় পার্মানেণ্ট হয় না, হারু ওভারটাইম পায় না—ভানু, নেলো ও পটল পাড়ার লোকদের পুরনো কাগজ ও শিশিবোতল কিনে দোকানে বেচে এবং দোকান ঝাড়ু দেবার কাজও পায় না। সকলের নৈরাশ্য ও বিফলতা ও জীবনের সকল দাবি অস্বীকৃত হবার জন্যে কোনো না কোনোভাবে ও অপরাধী। ও এদের সকলের মধ্যে থাকে। এদের জীবন ওর সেই ঘর, যে ঘর ও পেল না। ওর অপরাধ। তাই শাস্তি দরকার কে শাস্তি দেবে?

চোলাই খাও, ম্যানড্রেক হও। সকলকে খিস্তি কর এবং মারো। ফিরে মার খেলে, চামড়া রক্তাক্ত হলে কিছু শান্তি। কিন্তু মিউচুয়াল হয়ে গেছে বলে অ্যালবার্ট মারে না। শিয়রচাঁদা সাপের মতো পলকহীন বঙ্কিম চোখে চেয়ে থাকে। 'হারামিকে বিশ্বাস নেই'—কাঙালী বলেছিল। বিশ্বাস নেই যদি তবে অ্যালবার্ট মারে না কেন? ও তো এখন মৃত্যুই চায়। অ্যালবার্ট, আমার আত্মহত্যা করার সাহস নেই। আমাকে মারো। অ্যালবার্ট মারে না। ফুঁপিয়ে কেঁদে ও উঠে বেরিয়ে যায়। চোলাইয়ের প্রতিক্রিয়ায় পথ চোখের লেভেলে উঠে আসে, নেমে যায়। সমুদ্র তরঙ্গ যেন। পথের দু'পাশে তেলিপাড়া লেনের একতলা বাড়ি গ্যাসের আলো মেখে দেখা দেয় ও হারিয়ে যায়। দেখা দিয়ে হারিয়ে যায় মাসির বাড়ির দাওয়া ও নলিনের আবাস।

তৃতীয় রিচুয়ালে ওর কোনো রিচুয়াল নেই, প্রকৃতির সকল রিচুয়াল। বাজারের কাদামাখা পথ ও অসমাপ্ত রাক্ষুসে ব্রিজ হয়ে যায় স্বচ্ছ নৈশ আলোয় দৃশ্যমান প্রান্তর। পড়ে-থাকা ল্যাম্প পোস্ট হয়ে যায় ছেদিত শিংশপা বৃক্ষ। ও সেই গাছে গিয়ে বসে ও ওপর-পানে না চেয়ে, বোঝে, পূর্ণচাঁদে গ্রহণ লেগেছে, মন্ত্র বলার সময় হয়েছে। 'কে বলে এটা ইন্দ্রের ঐরাবত? কামরূপী বারণ হয় কত মত···' ও অস্ফুটে বলে চলে, মনে মনে ভাবে দেওঘরে মামাবাড়ির প্রশস্ত চাতাল, বাতাসে য়ুক্যালিপটাসের গন্ধ, পৌঁছে যাব, পৌঁছে যাব, গাছ নড়লেই চোখ চেয়ে দেখব দেওঘরে আমি, ছোট্টটি হয়ে গেছি।

চতুর্থ রিচুয়াল কাঙালীর। ও ওকে খুঁজে এইখানে আসে। গায়ে হাত রাখে।

—গুরু!

—কে?

—গুরু, চল।

—কাঙালী, আমি কামাখ্যার গাছচালানো মন্তর পড়েছি। ডাকিস না বাপ। গাছ নড়লেই আমি পৌঁছে যাব।

—গাছ কোথা গুরু ? ও তো ল্যাম্প পোস্ট।

—নড়লেই আমি পৌঁছে যাব।

—কো'জ্ঞাবে গুরু ?

—তোকে বলব কেন ? দেওঘর যাচ্ছি, বন্তিনাথে। সেখানে জন্মেছিলাম তো ? মায়ের পেটে ঢুকে যাব শ্‌লা। কোন্ হারামি আর বেরোয় ?

—চোলে চল গুরু।

—যাব ?

—হ্যাঁ।

—চ্চ।

—কোনদিন কারখানা হতে আসতে আমার দেরি হবে। হারামি অ্যালবার্টের এলাকা। শ্‌লা ভাড়াটে গুণ্ডা। মিউচুয়ালের মর্ম বোঝে না।

—চল্।

পঞ্চম রিচুয়ালে স্টেশনের ওভারব্রিজ। নেলো-ভানু-পটল ভিখিরি-ভেণ্ডার-মেয়ে, বেশ্যা ও মগাইদের সঙ্গে লড়াই ক'রে জায়গা রেখেছে। সেখানে গড়িয়ে পড়া।

এভাবেই চলতে থাকে, চলতে থাকে। কাঙালী কাকার কাছ থেকে টাকা আনে। রুনকি কাকাকে বলে, আপনি কেন জেনে নেন না ও কোথায় আছে ? কেন জেনে নেন না ?

কাকা জিগ্যেস করেন না। তিনি এখনো বিশ্বাস করেন, ওর নাম উচ্চারণ না ক'রে ওর অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে চললে ওঁর সম্ভ্রান্ত অস্তিত্ব ঠিক থাকবে। তা থাকে না। ওর বিরাজমানতা এখন এক প্রতাপ-শালী সত্তা। সে সত্তা কাকার অন্তরেও অবক্ষতি ঘটায়। স্ত্রীর কান্না ও মিনতি, ওকে ডাকো, ওকে ডাকো, আমার মুখাগ্নি ও করবে।—জোর ক'রে ভুলে যান কাকা। ভাবেন, যে কোনোদিন ও মরে যাবে। হতভাগা। 'হতভাগা' মনে মনে বলতেই বোঝেন, উনিও এ দীর্ঘ

সংগ্রামে ভেঙে পড়ছেন। এখন উনি রুনকিকে খোলাখুলি অভিযুক্ত করেন।—এসেছিল যখন, তখন সুপিরিয়র না সেজে, তাকে ধরে রাখনি কেন!—উনিও পালটে যান। শেষ সাক্ষাৎকারে ওর জীর্ণ, মলিন পোশাক মনে পড়ে। ভাইপো-ভাইঝিদের উনি, ওঁর পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা, ভালোবাসতেন। ও খুব মিডিওক্যর ছিল। জীর্ণ পোশাক, কণ্ঠার হাড় বেরুনো, চোখ ছু'টো কার মতো? হঠাৎ মনে প্রবল আঘাত। জীবনযুদ্ধে পরাজিত ওঁর দাদা, ওদের বাবার মতো। দাদাকেই কি উনি ফিরিয়ে দিলেন সেদিন? বিবেক দংশনে উনি প্রম্‌পট্‌লি ভারত সেবাশ্রম সংঘে টাকা দিয়ে আসেন। ওরা গরিব ছুঃখীর জন্যে কাজ করে।

বড়দি-মেজদি-ছোড়দি-দাদা-ছোড়দা—সকলের কাছে ও ক্রমে খুব প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। রুনকির কারণে। সমগ্র ব্যাপারটির জন্যে রুনকি ওঁদের দায়ী করে, ওঁরা রুনকিকে। রুনকি বলে, যখন এসেছিল তখনি দেখেছি চেহারা। কতদিন খায় নি। কি রকম জামাকাপড়?—বলে এবং অঝোরে কাঁদে। বিভ্রান্তি। ও ফিরে এলে রুনকি ওকে মেনে নেবে কি না, একথা জিগ্যেস করলে রুনকির মনের যে অংশটুকু সুস্থ ও র‍্যাশনাল সে বলে, তা আর সম্ভব নয়।—কিন্তু সকল মানবের মতো ওর মনেরও অধিকাংশই ইর‍্যাশনাল। তাই মনে হয়, নিশ্চয় থাকব।— সকলেরই এখন যুক্তভাবে মনে হয়, দশ বছর বড় বেশি সময়। এতটা সময় বয়ে যেতে দেওয়া ঠিক হয় নি। রুনকি, এক হিষ্টিরিয়া থেকে আরেক হিষ্টিরিয়ায় গিয়ে পড়ার মধ্যবর্তী সময়ে অদম্য হাসিতে কাঁপে ও বলে ও বলত, 'তোমরা সবাই ব্যারেন জীবন যাপন কর।' ঠিক বলত। সবই ব্যারেন।—হাসি থামাতে পারে না ও, এবং তখন ওকে সেডেটিভ ইঞ্জেকশান দিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়। ঘুমোলে এখন আর রুনকিকে সুন্দরী মডেল অথবা গডেসের মতো দেখায় না।

এইভাবেই চলে, চলতে থাকে, আরো চলত। কিন্তু ব্রিজের ওপারে ছু'নম্বর ঠেকে বিষাক্ত স্পিরিটের চোলাই খেয়ে তিন জন মারা যায়।

ও নিজেও যায় পুলিশ মর্গে। কারণ, রাইফেল। অত্যন্ত পিলেপটকা, মোদো মাতাল মাছের ভেণ্ডার, 'রাইফেল' নামটি ওর কেন হয়েছিল তা জানা যায় না। অ্যালবার্টের বিরাগের ভয়ে রাইফেল দু'নম্বরে মদ খেত। বিষক্রিয়ায় সে মারা যায়, এবং যেহেতু এ অঞ্চলে কোনো ন্যাড়া-বোঁচা-ন্যাংটো-ফকিরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ওকে বাদ দিয়ে হবার নয় সেহেতু সকালে কাঙালী ওকে ডাকে। বলে, চল গুরু।

—কেন?

—রাইফেল টিকিট কেটেছে।

—মরে গেল?

—জীবন দিয়ে পাবলিকের কাজ ক'রে গেল গুরু। দু'নম্বর বন্ধ। লালমণি জেলে। রাইফেলের কেসটা ক্যাঁচা হয়ে গেল গুরু, বউটা হেভি কাঁদছে।

—চল্।

ওর চটি ও জামা-প্যান্ট কাঙালীদের বাড়ি রাখে ও। গামছা নেয় কাঁধে। বলে, দাড়ি না কামিয়ে জঙ্গল। ঘাটে কামিয়ে নেব। আমার টাকা তো আছে?

—হ্যাঁ।

—নে।

—আরে টাকা তুলব।

—রাখ্ রাখ্। কে কত টাকা দেনে-আলা জানা আছে। ফুল নিতে হবে। রাইফেল কত কালের ঠেকি-ইয়ার। ফুটো ভিখিরির মতো যাবে না কি?

পুলিশ মর্গে ঢুকতে গিয়ে ও দাঁড়িয়ে পড়ে।

—কি হল, গুরু? সাদা হয়ে গেলে?

—আমি এখানে দাঁড়াই। গা-টা কেমন করছে।

—আমি যাই। আই বাস! কি পার্টি এসেছে গুরু! মড়া দেখছে, দেখ। তাই এত বড় গাড়ি।

শবদেহগুলি দেখে, মাথা নেড়ে, বিশ্রস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত রুনকি বেরিয়ে আসে। বড়দা ওকে ধরে ধরে আনেন। ওঁর মুখও মলিন, ফ্যাকাশে। ওরা গাড়িতে ওঠে। গাড়ি ছেড়ে দেয়।

নিশ্বাস টানে ও। ভেতরে যায়। প্রাথমিক প্যারাফেরনেলিয়ার পর ব্যবচ্ছিন্ন রাইফেল স্বীয় ভিসেরাটি ফোরেনসিকের জন্যে বোতলে রেখে খাটিয়ায় চাপে। ক্যাওড়াতলার পথ। নাচতে নাচতে চলে ও সবার সঙ্গে। আবার বল হরিবোল, প্রেমসে বল হরিবোল, নেচে বল হরিবোল—প্রয়োজনীয় শ্লোগান দিতে দিতে।

ক্যাওড়াতলায় অস্থি বিসর্জনের সংকীর্ণ ঘাটে ওকে প্রায়ান্ধ বুড়ো ধরে। মৃত্যু ও শবদাহে ওর বেজায় আকর্ষণ।

—কত্‌কাল পরে দেখচি গুরু?

—বেঁচে আছ?

—তুমি চশমা কইরে দেবে, ভালো ক'রে জগৎ দেখে তবে মরব।

—সকালেই টেনেছ?

—না গুরু। পয়সা কোতা?

—এই কাঙালী, দাদুকে একটা টাকা দে।

—দিচ্ছি।

—বেঁচে থাকো গুরু। বুড়ো মানুষের আশীর্ব্বাদ।

—বাঁচতে বলছ?

—বাঁচবে না মানে? একেনে হেনস্তা হলে, ওকেনে নে গেল কে? ক্যাঙালীরা সব সোনার টুকরো ছেলে। ওকেনে সবাই বেঁচে থাকে।

—তুমিও চল।

—না গুরু। এই বুজলে না, স্বাবলম্বী মানুষ। সময় হলে নিজের মুখে আগুন দে চিলুতে চড়ব।

—তাই হবে।

—মনটা যেন কেমন হয়ে আচে? দুঃখু কোরনি গুরু। সময় হলে, ডাক পড়লে রাইফেল-বোম-ছুরি সবাই চিলুতে চড়ে। শ্‌লার

ইলেট্‌টিরি চুলো বন্দ হয়ে আচেন। উনি চাট্টি মড়া টানতেন। তাতেই ভিড় এত।

অত্যন্ত অবসন্ন ও বিশ্রস্ত মন নিয়ে ও ক্যাওড়াতলা, কার্তিক ঘাট ঘোরে ফেরে। তারপর কাঙালীকে বলে, আমি যাচ্ছি রে। তুই কারখানা চলে যা।

—এখন কেন? নাইট ডিউটি।

—নাইট ডিউটি হচ্ছে?

—এবার হল। তুমি কিন্তু বেশি রাত কোর না। কাল মাসি আসছে, জান?

—কাল থাকবে।

—অস্বস্তি। বিপন্ন ও। মাসি যদি বলে, চল বাবা আমার সঙ্গে? রুনকি আজকাল মর্গে এসে চোলাই খেয়ে মৃতদের শবদেহে ওকে খোঁজে? মনের কোথাও রুনকি নেই। একদিন ছিল।

সারাদিন ওভারব্রিজে বসে কাটিয়ে দেয় ও। আজ স্নান করে না, বাজারের হোটেলে খেতে যায় না। আজকের দিনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। নলিন মন্ত্রপড়ার দিনে উপোস ক'রে থাকত। বুড়োকে চশমাটা ক'রে দেওয়া হল না। কাঙালীর প্রথম নাইট ডিউটি আজ। এত সুযোগ ও আর পাবে না।

সন্ধ্যায় কাঙালী যায় ডিউটিতে। ভানু-নেলো ও পটল বলে আমরা জায়গা পাহারা থাকব গুরু। চলে এস। আজ কাঙালী নেই।

—আরে ঝপ ক'রে চলে আসব।

—ঝটপট এলে 'বৈরাগী'টা সেরে দেব তিনজনায়। দিলীপকুমার তিনটে রোলে মাইরি।

—নিশ্চয়। আরে জায়গা ঠিক থাকবে। এদ্দিন শুচ্ছি। তোরা হলে চলে যাস।

—আসব, আসব।

—পিকচার না দেকলে গুরু!

—বললাম তো।

—আজ খেতে দেরি করচ ?

—এই যাব। ঝপ ক'রে খাব, চলে আসব।

—সেকেন্ শো। আমরা চলে যাব।

বুঝেছি।

—রাইফেলের বউটা ভেসে যাবে।

—তোরা দেখিস।

—বিশ্বদুনিয়াকে তো দেখতে সাধ যায় গুরু। ট্যাঁক যে মন্ত্রীর কতা দেওয়া।

—চশমাটা রাখ্।

—সে কি ? দেকতে পাবে ?

—পাওয়ার বদলাতে হবে। ওটায় অসুবিধে হয়। কাঙালীর বাড়ি রেখে যাস।

—রাকব।

ওরা চলে যায় সিনেমার টিকিটের ধান্দায়। ও ঠেকের দিকে চলে। সাতটা বেজে গেছে। চশমা না থাকায় সব ধোঁয়াটে। দূরে দূরে চলে গেছে যেন সব কিছু। খুব সন্তর্পণে যায় ও। কাঙালীর বয়সও বেশি, দায়িত্বজ্ঞানও বেশি। ভানু-নেলো-পটলা ছেলেমানুষ তো। তবে ওরাও হীরের টুকরো ছেলে সব। রাইফেলকে দাহ করল তো ওরাই। সব ওরাই করে। সব সময়ে সব করে। জীবনেও আওয়াজ দেয় না মেয়েদের, চুরি ছিনতাই করে না। যারা করে তারাও ভালো। ভালো সবাই, স—ব, পৃথিবী খুব সুন্দর। সব কত দূরে, কত অস্পষ্ট, দোকান, আলো বাড়িগুলো।

ঠেকে ও ঢোকে। অ্যালবার্ট বসে আছে। ও সরাসরি ঠেকের সকলকে বিস্মিত ক'রে হেঁকে বলে, দিয়ে যাবি আজ, থামবি না মোটে। কাঙালীর আজ নাইট ডিউটি। ব্যাটার মাসিগিরির চোটে আশ মিটিয়ে খাওয়া হয় না কতকাল।

প্রথম বোতলটি ঝপ্ ক'রে কবজির ঝাঁকিতে গলায় ঢেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বোতল। ভেতরে সব জ্বলতে থাকে। খালি পেটে নেশা বেশি। কিছুক্ষণ সব আবছা হয়ে হারিয়ে যায়। তারপর তৃতীয় বোতল। বেহারী দাসের অনুনয়, আর খেও না গুরু।— ও শোনে না। ভীষণ ভিতু ও, রক্তে বড় ভয়। কিন্তু রক্তই ওকে মুক্তি দিতে পারে আজ। নলিন এখন ওর চেতনায়। হ্যাঁ নলিন। কিন্তু আরেকটু জোর ক'রে খেতে হবে। বেহেড হতে হবে। হচ্ছি না। ঘামছি কেন? ও মাথা রাখে সামনের উচু বেঞ্চে।

অনেক, অনেক সময় যায়। বেহেড হলাম না, বেহেড হলাম না। চশমাহীন প্রায়ান্ধ চোখের জল মোছে ও। ঠেক বোধহয় খালি। কোনো কথাবার্তা নেই। বাকি মদটুকু গলায় ঢালে ও। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। বমি উঠে আসছে। পয়সার মাল, বমি হোয়ো না। পেটে খাদ্য নেই, উঠলে তুমি উঠবে। জড়িয়ে বলে, কি মাল চালালে বেহারী? দু' নম্বরের খেলা দেখে ঘাবড়ে গেলে? নেশা তো জমল না?

বেরিয়ে পড়ে ও। বলে, কাঙালী পয়সা দিয়ে যায় না? বিনে পয়সায় খাই?

পড়ে-থাকা ল্যাম্প পোস্টটি কত দূরে? সব আচ্ছন্ন দেখায় চোখে। বুঝতে পারে, তেলিপাড়া রোডের বাড়ি, নলিনের ঘর, মাসির বাড়ি আজ দেখা দিয়ে থেকে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে না। চশমা থাকলে ও দেখতে পেত। তেলিপাড়ার বাড়ির দরজা আজ খোলা। মা আছেন, কাকিমাও। নলিন তার ঘরের দাওয়ায়। মাসির বাড়িতে মাসি। সবাই আছে। ল্যাম্প পোস্ট।

খুব সন্তর্পণে বসে ও। আজ ল্যাম্প পোস্ট নড়বে। শিংশপা গাছ। সাত রবিবার এই গাছের গোড়ায় এসে ও সূর্যনারায়ণের পুজো দিয়ে ফিরে গেছে। অষ্টম রবিবারে সূর্যাস্তে মন্ত্রপড়া কুড়োলে গাছ কেটেছে। আজ, পূর্ণ চাঁদে গ্রহণ লাগার জাদু সময়ে ও গাছের কাছে এসেছে।

চড়ে বসে ও, মাথা হেলিয়ে সামনে রাখে, জড়িয়ে ধরে দু'হাতে।

—কে বলে এটা ইন্দ্রের ঐরাবত? —ও বলতে শুরু করে।

অ্যালবার্ট কাছে আসে। খুব কাছে। হাত তোলে।

—কামরূপী বারণ হয় কত মত? কত মত? কত মত?—অ্যালবার্ট হাত নামায়। ছুরির ঝিলিক অন্ধকারে। শিংশপা গাছ নড়ে ওঠে। ও পৌঁছে যায় নিজের আবাসে।

॥ তিন ॥

সিনেমা ভেঙে গেলে ভানু-নেলো ও পটল ওকে ওভারব্রিজে পায় নি। ল্যাম্প পোস্টের কাছে গিয়ে ওরাই প্রথম দেখে, ও ভানুর আর্ত, আর্ত, আকাশচেরা কান্নায় লোকজন ছুটে এসেছিল। বিটের পুলিশ।

হাসপাতাল। পরের দিনের কাগজ, 'পুরুষ, বয়স বেয়াল্লিশ। হাসপাতালে আনা হলে ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।'

কাঙালী কাকার কাছে গিয়েছিল। কাকার বিশ্বভুবনে বিস্ফোরণ। পোস্টমর্টেম বন্ধ করতে হবে।

পোস্টমর্টেম হয়। কাঙালীরা ভীষণ প্রতিজ্ঞায় কঠোর মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, গুরুর বডি আমরা নিয়ে যাব।—বাতাসকে ঘোষণা করে!

পোস্টমর্টেম তাড়াতাড়ি করার জন্যে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা মর্গে আনা হয়েছিল বডি। মর্গের বাইরে এখন সারে সারে গাড়ি আসতে থাকে। গাড়িতে ফুল, ফুলের পাহাড়। অত্যন্ত দামী পারফিউম শিশির পর শিশি। ডানলোপিলোর সিংগ্‌ল গদি, বালিশ, ধবধবে চাদর। কাঙালীরা এখন পঞ্চাশজন। মাসি লুটিয়ে পড়ে শবদেহে, এ কি মুক দেকালে, অ আমার বাবা! এই ঝন্যি কি পেরায় এট্টা বচর এমন করে মায়ায় বেঁদেছিলে? অ বাবা, মুক তুলে চাও, আমি তোমায় লে ঝেতে এইচি গো!

মেশো মাথায় হাত রেখে কাঁদে ও কাঙালীর দাদা হারু শবদেহের মাথায় হাত বোলাতে থাকে। গাড়ির লোকগুলি খুবই স্তব্ধ, বিচলিত।

কাচের গাড়ি।

কাঙালী এদের কাউকে চেনে না কাকাকে ছাড়া। কাল সকালে খবর পাবার পর থেকে এখন অবধি ও চা ছাড়া কিছু খায় নি। রাতে ঘুমোয় নি।

ও কাকাকে বলে, খাটিয়ে এনিছি, ফুল আমরাও এনিছি। উনি আমাদের, আমরা নে যাব। আমরা সবাই কাঁদ দেব। উনি আমাদের ছিল।

কাকা ভাঙাগলায় বলেন, আমি কিছু জানি না।—উনি অঝোরে কাঁদেন ও বলেন, ওর দাদারা ·· ওর স্ত্রী···।

—আমরা নে যাব।

এখন রুনকি এগিয়ে আসে। কাঙালীর হাত জড়িয়ে ধরে। বলে, তোমরা সব করেছ। এইটুকু যদি···

কাঙালীর মনের প্রতিরোধে ফাটল ধরে। মানুষের আন্তরিক অনুভূতির সামনে ও অসহায়। ও কিছু বলতে পারে না। শুধু বলে, আপনি বউদি?

রুনকি ঘাড় হেলায়। চোখের জল আটকাতে ওকে বারবার কালো চশমা খুলে চোখ মুছতে হয়। এই সময়ে বড়দা এগিয়ে আসেন। মৃদু, বিনীত কণ্ঠে বলেন, শোন ভাই!

কাঙালীকে উনি কাঙালীদের দলের সকলের মধ্যে নিয়ে যান। কেঁদে ফেলেন ও বলেন, তোমাদের দাবি যে অনেক বেশি, তা কি জানি না? আমরা কিছুই করি নি, তোমারই সব করেছ। কিন্তু ভাই! পরশু রাতে ও চলে গেল। কালকে, আজ এতক্ষণ অবধি ঠাণ্ডাঘরে ছিল, এখান থেকে ক্যাওড়াতলা! এক্সপোজার লাগতেই, মানে রোদ লাগতেই, বডি ডিকম্পোজ করবে। তোমরা যদি দোষ না নাও, তবে বলি···

কাঙালী এখন মনে করতে পারে সেদিন, রাইফেলের লাশ যখন ওরা আনতে যায়, গুরু ভেতরে ঢোকে নি। এদেরই দেখেছিল কাঙালী।

বড়দা বলেন, ওকে আমরা খুঁজেছি, অনেক খুজেছি, বুঝলে? পাই নি।

চোখ মোছেন উনি। কাঙালীর দাদা হারু বলে, খুঁজতেন মড়ার মধ্যে। জীয়ন্তে কোথা আছে খুঁজতেন? খুঁজলে পেতেন না?

—মানছি, সব মানছি। শুধু যদি এটুকু বিবেচনা কর, স্ত্রীর অবস্থা তো দেখছ? গাড়ি ক'রে ঘাটের মুখ অবধি নিই? না হয় গুরদোয়ারা পর্যন্ত? সেখান থেকে তোমরা কাঁধ দিও?

কাঙালী মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে, ঠিক আছে।—আপত্তির গুঞ্জন ওঠে। ও ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলে, গুরু আমাদের ছিল, আমাদের রইল, আমাদের থাকবে। গুরু কারো মনে কষ্ট দিতু নি। গুরু আমাদেরকে সর্বরকমে শিক্ষা শিকিয়ে গেচে। এনারা যে কতা বলচে, তা গুরুর কতা মনে রেকে আমরা শুনি।

বড়দা বলেন, তোমরা গাড়িতে যাবে ভাই? অনেকগুলো গাড়ি…!—না।

—হারু এবার মেজাজ রাখতে পারে না। বলে, ক্যাঙালী! এই বিচার কল্লি? জ্যান্তে কেউ দেকল না, একন এসেন রে, ফুল রে, ওগুনোর এট্টার খরচায় গুরুর ক থালা ভাত জুটত মনে করিচিস? ভাত পায় নি গুরু…হারু কেঁদে ও বুনো মোষের মতো মাথা ঝেঁকে বলে, তাই হোক! বে করা পরিবার, দাদা, কিছু বলব না, তাই হোক। ধুতি পাঞ্জাবি কোতা?

—এ কাজে অভ্যস্ত হারুরা ওকে দামী ধুতি-পাঞ্জাবি পরায়। দিদিরা, দাদারা পারফিউম ঢালতে থাকেন, বউদিরা চন্দনের বাটি ও ফুলের মালা হাতে এগিয়ে আসেন। কাঙালী চশমাটা বড়দার হাতে দেয়।

গাড়ি বেরিয়ে যায়। কাঙালীরা এবার খাটিয়ায় চাদর বিছায়,

নারকোল দড়ি, ফুল। হরিধ্বনি দিয়ে ওরা খাটিয়া তোলে। এখান থেকে ক্যাওড়াতলা অনেক দূর। রোদে ভীষণ তাত। শবাচ্ছাদন বস্ত্রে খাটিয়া ঢেকে দেয় ওরা।

পঞ্চাশজনের শবযাত্রীদল কাঁধ বদলাবদলি ক'রে হরিধ্বনি দিতে দিতে চলে। হরিধ্বনিটি ভীষণ সংকল্পে কঠোর, শোকে পবিত্র ও গম্ভীর। কলকাতার লোক অবাক হয়ে দেখে শূন্য খাটিয়া কাঁধে ওদের শ্মশানযাত্রা। ওরা কাঁধে গুরুভার অনুভব করে, ভীষণ ভীষণ ভার, কেন না ওরাই গুরুকে নিয়ে যাচ্ছে। যে গুরু এভরিম্যান। সাধারণ, স্বল্পে সন্তুষ্ট, নির্বিরোধী এভরিম্যান। কলকাতা যাদের জন্যে সৃষ্ট এবং কলকাতা, তথা পশ্চিমবঙ্গ যাদের ভুলে গেছে।

ছেলেগুলি তারই শব বয়, ওদের মুখ কঠোর। শোকার্ত, গম্ভীর। কলকাতার লোক যখন ওদের মুখ ভালো ক'রে দেখে একমাত্র তখনি বোঝে, ওই খাটিয়ায় নিরন্ন ছেলেগুলি পবিত্র থেকে পবিত্রতম এক শব বইছে। সময়ের শব।

জাতুধান

জাতুধান মানে যে রাক্ষস, তা সাজুয়া তিওর কোনদিন জানতে পেত না। রাম সিংগির মাতৃশ্রাদ্ধে সে উপাধিটি অর্জন করে। ভাগীরথীর কুলাশ্রিত বেলেটি নামক সেমি-শহর ও সেমি-গ্রামের তিওর পাড়ার অশেষ সৌভাগ্য, রাম-জননী অঘ্রানের ধান গোলায় তুলে, নবান্নের উৎসব সেরে তবে মারা যান। শ্রাদ্ধ হল অসাগর ধান-চালের দিনে। রামসিংগি একদা জমিদার ছিল, তিওররা ছিল তার প্রজা। বর্তমানে রাম সিংগির জমিতে তারা বর্গাদার। ফলে উপোসী কেন না উক্ত জমিটি চর-জমি। ভাগীরথী, চরটি এ-সনে ভাসান, ও-সনে ডোবান। তবু মাতৃশ্রাদ্ধে রাম সিংগি সকলকেই ডাকে। বাইন কেটে ভাত রাঁধা হয়। সাহেব বাড়ির বাথরুমের বড় বড় টব, নিলেমে কেনা, তাতে ডাল ঢালা হয়। তিওররা কাঠ আনে, কলাপাতা, উঠোন চাঁছে এবং ভরা শীতে, বর্ণোচ্ছেদের জাত বাঁচাতে বাইরে বসে থাকে। সেখানেই ওদের পাত পড়ে।

সাজুয়ার সামনে এসে রাম সিংগি অন্যদের বলে, 'এর কথাই বলছিলাম। মা ওকে বসে খাইয়ে গেছে। পাকা দু কিলো চালের ভাত জলপান খাবে, আবার বিকেলে আড়াই কিলো চালের ভাত।'

সাজুয়া কথা না বলে খেয়ে যাচ্ছিল। ওদের বেলা ভাত-ডাল-কুমড়োর ঘ্যাঁট ও মাছের টক। ভাতের পাহাড় উড়িয়ে দিচ্ছিল ও কথা না কয়ে। ওর রাক্ষুসে খাওয়া লোকে দেখে ও জানে। ও তাতে বিচলিত হয় না।

পুরুত দাওয়ায় বসে দেখছিলেন। তিনি বললেন, 'মিষ্টি মেঠাই তাহলে ওই ওড়াবে?'

সাজুয়া মাথা ঝাঁকাল। রাম সিংগি বলল, 'না ঠাকুর মশাই।

ভাত খাবে পাহাড় প্রমাণ। সাজুয়াকে জব্দ করতে হলে মিষ্টি দেন পাতে। আট-দশটা খেলেই মুখ মেরে যাবে।'

পরিবেশকরা সাজুয়াকে আবার ভাত দিল, ডাল। বলল, 'মাছ খাবি না?'

'খাব।'

'ডাল দিয়ে বেটা পাহাড় সাফ করছে।'

'তুমি দিবার, দিয়ে যাও না মশাই।'

'লয় লিয়ে যাস?'

'মশায়, যত খেলাম, তত খাব। লিয়ে যাব কাল। এঁটো বাসি লিব। আজ খাব।

'হেই সাজুয়া, মরবি বাপু।'

'তা দেখ, মা জননী লিত্য মরবে?'

দেখতে দেখতে পুরুত বললেন, 'এ বেটা জাতুধান। মানে রাক্ষস।'

সাজুয়া খেয়ে এসে বামুনকে প্রণাম ঠুকল। বলল, 'কি বলছিলে হে ঠাকুর? খাওয়া দেখছিলে? খাওয়ার লেগে রাক্ষস মোরে বলে সবাই। উ পরিবারও বলে। লামে কি হয়? পেটে খেলে লামের লাথ সয়।'

সাজুয়ার বউটি ছোটখাট, গোল-গোল গড়নের শ্রীময়ী মেয়ে। সে ফিক করে হাসল।

পুরুত বললেন 'রাক্ষস কি হে। তুমি বাবা জাতুধান। "রাক্ষস" নামে জাঁকজমক নাই। জাতুধান বললে বেশ মানাচ্ছে।'

'তা ভাল।'

'তা বাবা, পেটটি করেছ বড়। পেটের অন্ন জুটাতে তো মুশকিল।'

'জুটে কই? জুটে না ত? যেদিন জুটবে, খুব খাব। না জুটলে পেটে কিল।'

সেই থেকে সাজুয়া জাতুধান। আর সবাই ভোজ পেয়েছে, ও একটা সম্মানী খেতাবও পেয়েছে। জাতুধান! নামটি ওর পছন্দ হয়েছে

উচ্চারণ করতে জিভেও এড়ে না। কাজ, মানে চাষ-কাজ যখন থাকে তখনি ওর পেট ভরা মুশকিল। যে বছর চর নেই, চাষ নেই, সে বছর ও বেরিয়ে পড়ে। যতদিন পারে, রাম সিংগির কাছে ধার নেয়। তারপর বউ ওর লুংগি, গেঞ্জি, গামছা কেচে দেয়। পোঁটলা বেঁধে ও রওনা দেয়।

বউ বলে, 'যেও না।'

সাজুয়া বউকে আদর করে। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলে, 'যেতে মন উঠে না। কিন্তক, ওই দশ কিলো চালে তোর আর মায়ের অনেক দিন যাবে। আমি রইলে সব খেয়ে ফেলব।'

'পেট মেরে খাও, ঘরে থাক।'

সাজুয়া গভীর, অপ্রতিরোধ্য দুঃখে মাথা নাড়ে। বলে, 'তাই যদিক পারতাম! ঘরে চাল আছে, ভাত খাব নাই, এ ভাবলে মোর মাথায় বাসুকি লড়ে। আমি রইতে তোদের আসান নাই। তাথে তুই কাজও করতে পারবি।'

'কোথা যাবে?'

'দেখি। মাতং যেথা লয়ে যায়।'

মাতং ওদের নেতা এবং বছর-বছর মাতং ওদের নিয়ে রাঢ় দেশে চলে যায় ধান চষতে। সাজুয়ার বিশেষ ব্যবস্থা। পেটভাতায় ধান চষে, কাটে, মজুরী ও ধানে নেয়। শীতের মুখে নৌকোয় ধান চাপিয়ে এসে পড়ে। নিজের বোরা বয়ে আনে। মাতং-এর ওপর ওর এবং ওদের অগাধ বিশ্বাস। অবিশ্বাস্য কম মজুরী ও পেটভাতায় কন্ট্রাক্টর-দের পথ মেরামতি, জোগালি কাজ, চাষের দাওয়ালী কাজ, ইত্যাদির এক বিস্তীর্ণ গুডউইল-মার্কেট তৈরি করেছে ও। কোন-না-কোন ভাবে ও লোকগুলিকে বাঁচায়।

সাজুয়াকে মাতংও বলে, 'রাক্ষস বলতাম, জাতুধান হলি। তা ভাল। কিন্তক আমি ক দিন? এই বুড়া মরলে তোদের হবে কি? কাজের সুতারশি ধরে নিবি, তা এমন খাওয়া খাস্, সে দেখে মানুষ ডরায়।'

'সেবার? কাটোয়ায়?'

মাতং হু হু করে হাসে ও বলে, 'সেবার কি হল শোন্ সাজুয়ার মা! কাটোয়াতে চাষ করে আমরা চলে আসব। কুণ্ডুবাবু ত বাড়িতে সত্যনারাণ দিছে। তার কাকা শোঁসাচ্ছিল, তা বুড়া সেদিনই মোল। অশুচ লেগে গেল। যত ভাত তরকারি ফেলা যাবে, ফল-সিন্নি। তা এই হতভাগা বলে, দাও দেখি, খেয়ে লই।—খেল বটে! সেদিন খেল, জাড়ের কাল, পরদিন খেল, আমরাও খেলাম, কিন্তুক ও খেল আমাদের দশজনার সমান।'

সাজুয়ার মা ক্ষিপ্র হাতে বাঁশের চেঁচারি চিরতে থাকে ও বলে, 'ও পেটে, মোরা ক্যানিং টাউনে, পঞ্চাশে আকাল হল। তা, আকালের যত মানুষের যত খিদা ওর পেটে।'

মাতং বলল, 'ওই ভাতের খিদা। কোথা যাব, খেতে এসে ধান পুজবে, তা পূজার ফল-মিষ্ট-বাত্‌সা ওর রুচে না।'

সাজুয়া বলল, 'ভাত হতে মিষ্ট কি, মোরে বল দেখি? উ শালোর বাত্‌সা-মুড়কিতে মুখ মেরে ল্যায়। থুঃ!'

এই রকমই সাজুয়া। আমাদের জাতুধান। কালো বিশাল দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কঠোর পরিশ্রমী বলে যা খায় তা গায়ে লাগে।

বউ এখন হাসে ও মাতংকে বলে, রঙ্গ দেখ যদি! সেদিন ঘরে চাল নেই। আমি আনতে গেলাম। খুব ঝড়। মা বলে, ছাগল তুটো ঘরে উঠা। তা হোথা শুয়ে র'ল খোসলা গায়ে? বলে, কি! বাতাসে ছাগল উড়াক, কান্দীতে নিক, ফরক্কায় নিক, আমি লড়ব না। অঙ্গ লাড়লে খিদা চেগাবে। তোর বউ আসুক, কত্‌খানিক চাল আনে দেখি, তখন যদি বা-বাতাস থাকে, তাইলে তোর ছাগল, সবার ছাগল তাড়য়্যে লয়ে ঘরে উঠাব।'

মাতং বলে, 'সেদিনই তুমি শালো, মনিবের পাঁঠা ঘরে উঠাল্‌ছ। ঝড়ের দিনে। মনিব জানে না, আঁ? তুমি?'

'আরে মোর ন্যাকা ভীম! সেদিনই তুমি, গোকুল, ফাগুনাল মাঁস খেছ। দিই নাই?'

'যাঃ, খাছিস তো খাছিস!'

'খুড়া, সম্‌সারে ত্যাত চাল, ত্যাত খাসি, ত্যাত সামিগগি! মনিব বেটার পেটে নানা রোগ। খেতে পারে না। আমি পারি। জুটে না। তাতেই জুটাতে হয়। মাঝেমধ্যে।'

'এবার বর্ধমানে নিব।'

'খুব খাব। ডিংলা সিজাব, বেগুন পুড়াব লুন মরিচ মেরে দিব। আঃ! বর্ধমানে কত ধানে রে! কানাল ছুটে যেমন লষ্ট মাগী, ধান হয় যেমন মাটির অঙ্গে মায়ের দয়া! খুব খাব।'

কথাবার্তা হয়ে যায়। সাজুয়া ঘর ছাড়ে। গভীর, গভীর পত্নী-প্রেমে, জননীর প্রতি ভালবাসায়। ও থাকলে, এই টানের দিনের সব চাল খেয়ে ফেলবে। ওরা বউ-শাশুড়িতে, আজ আমানি, কাল পন্থি, পেট মেরে মেরে খাবে ক দিন ধরে। চলে যাবার কালে কোলের ছেলেটা, একমাত্র সন্তান ওদের, গেঁদা মুনা শিশু জগন্নাথের জন্যে সাজুয়ার কষ্ট হয় এবং ও ভাবে, ফরক্কায় টাকার খেলা, চারদিকে কত রাস্তা, ব্যবসাবাণিজ্য, ওকে কেন পেটের ভাতের জন্যে চলে যেতে হয়?

মা বলে, 'তার আনিস।'

বউ বলে, 'লাল নীল নাইলং সূতা।'

ও বলে, 'আনব।'

তার এবং বেত এবং নাইলন সুতোয় বেঁধে নানারকম ডালা, ঝাঁপি, সাজি তৈরি করে এরা বাঁশ চিরে-চিরে। মহাজন নিয়ে যায়।

এই ভাবেই চলে, চলতে থাকে, যতদিন না নতুন ঢঙে বান আসে।

রঙের বান, ঢঙের বান। আকাশে মেঘ ঘুরে ঘুরে ফেরে। চেপে বৃষ্টি হয় না। যেন শরতের বৃষ্টি। আসে যায়, আসে যায়। সাজুয়ার মা বলে, 'যত জল সব শওরে? চাষী-বাসী দেশে জল নেই?'

'থাক না থাক, এবার অসাগর ধান, মা।'

ধান এবার হবেই হবে। গাছের গত্ কি, এই মোটা। পাতাগুলি ঘন সবুজ, তেজাল। চরাল্ জমি, সরকারী সার, খুব জেঁকেছে চাষ।

সাজুয়া জগন্নাথকে কোলে নিয়ে লুফল। বলল, 'বউ! চল্ তোরে চর দেখাই।'

'তুমি দেখ।'

'চল্!'

'মহাজনের দাদন্!'

ধান-কাটার সময় এদের পেট চলে মহাজনের দাদনে। সাজি-ডালা-কুলো তৈরি করে। সাজুয়া বলল, 'র, আমি চিরে দেই?'

'দিলে খেতে চাইবে।'

'হ হ! বলতে দিব না কিছু। ধান-চাল বাড়ি লিয়ে আসছি।'

'মা বলল, 'ত্যাত বুদ্ধি। তাতেই রাম সিংগি পাওয়ানা কাটে তোর?'

'এবার একটা ডাবা আনব।'

'গরু কোথা?'

'গরু কেন? বড় হাঁড়িতে ভাত রান্‌বি, ফ্যানেভাতে ডাবায় ঢালবি, আমি লুন-মরিচ ফেলব আর খাব। এক ডাবা!'

বউ বলল, 'তবে আর কি! খুর গজাবে, লেজ গজাবে, শিং বেরবে।'

সাজুয়া রাগ করল না। ওদের সমাজে সাম্যবাদ। মা বুড়িও বসে খায় না, বউও বসে খায় না। ওরা সম্বচ্ছর খেটে খায়। সমানে-সমানে কথা ওদের মধ্যে চলে। মা ওদের হাসি শুনল। বলল, 'ঘরে বসে রঙ্গ! যা না, গিন্নি মা বাগাল চাঁছাবে?'

রাম সিংগির নারকোল গাছগুলির পাতা চেঁছে কাঠি বের করার কাজটি সাজুয়া নিজেই নিজেকে দিয়েছে। তখনি ও মনিববাড়ি গেল। কপাল ওর খুব প্রসন্ন। মনিব্যান বলল, 'বাইরে শুনে যাস্।'

'কেন, মনিব্যান?'

'শোন্ গা।'

রাম সিংগি বলল, 'কাজ আছে, বুঝলি? নারকেল বাগানে চালা বাঁধ ক'টা।'

'কেন?'

'বেটা জাতুধান! খেতে জানে, ভাবতে জানে না। গরু-মোষ রাখতে হবে না?'

রাম সিংগির গাই-মোষ অনেকগুলি। দুধের টাকা মনিব্যানের নিজের টাকা। বছর তিরিশ আগে, বাঁজা মনিব্যানের সম্মতি নিয়ে রাম সিংগি শালীকে বিয়ে করে। সম্মতি দিয়ে মনিব্যান ডাক ছেড়ে কাঁদতে বসেছিল। তখন রাম সিংগি এক আঁজলা টাকা দিয়ে বউকে বলে, 'মোষ কেন, দামী মোষ। দুধ বেচ। এ তোমার স্ত্রীধন হল।'

রাম সিংগির দ্বিতীয় পক্ষ পুত্র ধন বাড়িয়েছে বছর-বছর। ছেলের মা। মনিব্যান বাড়িয়েচে স্ত্রীধন। দুধাল গাই-মোষ নিয়ে তিনজন চাকর ভাগীরথীর পাড় ঘেঁষে থাকে। পর-পর চালা ঘরে সমৃদ্ধ বাথান।

সাজুয়া রাম সিংগির কথা শুনে, কেন গোয়াল তুলতে হবে তা জিগ্যেস করল না। সে কথা মনেই এল না ওর। ও বলল, 'সে ধরেন যেয়ে গরু-মোষে অ্যানেক। তা, টান চালা বেঁধে দিব। মাতংরে বলি? ওরা যা লিবে তা লিবে। আমার শুধু পেট খোরাক আর বিড়ির পয়সা।'

'পেটখোরাক?'

'দু বেলা।'

'অ্যাঁ?'

'হাঁ বাবু। তাতে ঘরে চাল বাঁচবে। মা বউ খেয়ে বাঁচবে।'

রাম সিংগির কথাটা খুব পছন্দ হয়নি। তবে মনিব্যান বলে পাঠাল, 'সাজুয়া দুবেলা কেন, চার বেলা খাবে। কোন কথা জানি না। আমার গরু-মোষ আমার সন্তান!'

ভরপেট ভাত খাবে, সেই আনন্দে সাজুয়া সব ভুলে গেল। মাতংকে ডাকতে গেল। মাতং সব শুনে বলল, 'আঁ? বাথান উঠাবে কেন?'

'তা শুধাই নাই।'

'বেটা জাতুধান লিচ্চয় বান ডাকবে।'

'হাঃ লদী দেখে বুঝ না?'

'বুঝ না? বেটা পেট চিনে। ভাত খাবে, তাতেই লাচ কত! শালা, এখন লদী দেখে বান বুঝা যায়? ফরক্কার জল ছাড়বে লিচ্চয়।'

'আঁ? জল ছেড়ে সব ভাসাবে?'

'আমি জানি।'

ওরা দুজন রাম সিংগির কাছে এল। রাম সিংগি কথাটাকে গুরুত্ব দিল না। বলল, 'যারা নাবালে আছে, তাদের ভয়। বাথান নাবালে। তাতেই সরাই। তোদের ঘর ডাঙায়, লয়? তোদের ভয় কি?'

'যদি বান ডাকে?'

'বান ডাকলে শালারা আমার কাঁধে চাপ না? আমার চালের ছান্দ কর না?'

মাতং বলল, 'তোমায় সরকার দেয়, তাতেই দাও। নইলে কি দিতে?'

'ওই করেই ত চলছে বাপু। তোরাও পেলি, আমিও দিলাম সরকারও দেখল। যা বাপ, চালাখুঁটি আনগা। নতুন খ্যাড় দিলাম!'

চালা কেটে, খুঁটি উপড়ে, নারকোল বাগানে নতুন বাথান বাঁধতে-বাঁধতে দু দিন গেল। মনিব্যান সতীনকে নিয়ে ভাত, কালাই ডাল, আমড়া-পোস্তর টক রাঁধল। অনেক খাওয়া। কিন্তু মাতঙের মনে কোথায় খোঁচ ঢুকে গেল।

কাজ সারা হলে মাতং বলল, 'বাস চেপে বহরমপুর যাব? সেথা সকল খবর পাব।'

'কে দিবে খবর? মাজিস্টর?'

'শালা লদী-আপিসে নাই?'

'তাই যাও।'

'আগে, মা বইত, খাল পাড় উঁচু রইত। ফরাক্কা হয়ে হতে কানে-কানে জল। এত্‌টুক্‌ বাড়লে পাড় ভাসাবে।'

'ডাঙায় ঘর!'

'শালা গুধা পেট চিনে। ঘর ত ডাঙায়, চর কি ডাঙায়?'

'না না, চর কখনো ডুবে? মা যখন ডুবায়, তখন ডুবায়। ভাসায় যখন, তখন ডুবায় না। এবার নিজে ভাসাল, ধান দিল, ডুবাবে?'

'জানি না।'

'পাড়ে যেয়ে হামু টেনে দেখলাম, পিঁপড়া ত ঠাঁই ছেড়ে যায় না?'

'রাম সিংগি নিশ্চয় কিছু জানে।'

'চল, চরে যাই!'

'দেখে লই দু-চার দিন।'

দু-চার দিন সময় দিল না ভাগীরথী। বৃষ্টি নেই, মেঘ নেই, শুক্ল-পক্ষের নির্মল আকাশ, পাড় ছেড়ে নদী নিঃশব্দে ডোমপাড়ায় ঢুকল।

ডোমদের চেঁচামেচি শুনে প্রথমে সাজুয়ারা ভাবে, ওদের শুওর পালিয়েছে। শুওর ওদের মাঝে মাঝেই পালায়। তখন হইহই পড়ে যায়।

তারপরই ওরা বুঝল, এ অন্য কোন বিপর্যয়। আলো এবং লাঠি নিয়ে ওরা বেরুল। কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। জল, সর্বত্র জল। বাবলা বনের ফাঁক দিয়ে জল। একটা কুকুর ছুটেছে।

মাতং চেঁচাল, 'হা পতিত! সদন হে! উঠে এস তোমরা!'

'আলো ধর হে—এ—এ—এ!'

'ধরলাম!'

সাজুয়া বলল, 'এখনো হাঁটু পরিমাণ। নেমে উদের টেনে আনি। ইঃ! এ যে বেপজ্জয় জল হে! ত্যাত জল?'

ওদের টেনে টেনে পাড়ে তুলতে সকাল হল। নির্মেঘ আকাশ। নির্মম সূর্য। ভাগীরথী ফুলে ফুলে উঠছে, জল দু পাড়ে ছড়াচ্ছে।

রাম সিংগির বাগানে ওরা চলে এল। রামের ছেলে বহরমপুরের

বন্যা-কন্ট্রোল আপিস থেকে খবর আনল। জল না ছাড়লে ফরাক্কা বাঁধ ভেঙে যেত। পদ্মা চ্যানেলে জল বহানো সম্ভব নয়। বড় বড় বিপর্যয় প্রতিরোধ করতে গিয়ে এই বন্যা।

রামের ছেলে মহোল্লাসে বলল, 'মেলেটারি লেমেছে। হাইওয়ের উপরে লৌকো চলছে। লৌকো বোঝাই মানুষ আনছে। ক্যাম্প হবে, চাল-আটা-ওষুধ-কাপড়, খুব বেবস্থা।'

'হেথাকার কি বেবস্থা?'

'আমাদেরই করতে হবে।'

'তুই আবার যা। গম আন্। ভেঙে সিজ্যে খাক। কত মানুষকে চাল দেওয়া যায়?'

মনিব্যান রাম সিংগিকে ভেতরে ডাকল। ছেলেপিলে হয়নি, বাঁজা মানুষ, পঞ্চাশে পৌঁছেও শক্ত শরীর। মনিব্যান বলল, 'চাল দাও, লিখে দিও। কাটবো।'

'তা ত লিখবই। চাল দেব?'

'দাও। বেপজ্জয় দুগ্যাতি মা।'

'দেখি।'

বিকেলের মধ্যে ডোমপাড়া রইল না। জলের চাদর বিছিয়ে গেল সর্বত্র। বাবলা গাছের মাথা জেগে থাকল। রাম সিংগি সাজুয়াদের বলল, 'বাইরে চালা বাঁধ্। এবার বাবুদের টনক নড়বে। আসবে সব। জল যদি বেলাটির খালে ঢুকে, আবাদ ভাসবে। শালারা বছর বছর দেখে যায় আর 'হবে হবে' বলে। সাজাখালির বাঁধটা সারালে জল ঢুকত?'

সাজুয়ারা বলল, 'ওরা করুক।'

'তোরা?'

'মোরা চরে যাব।'

'কেন?'

'মোদের জান সেথা।'

'চর। চর আছে?'

মাতং অভিজ্ঞ লোক। সে বলল, 'না থাকবে বা কেন? চর ডুবলে সাজাখালি ডুবে। সাজাখালিতে পুলিসের ঘাট-চৌকি। ঘাট-চৌকি ডুবলে জানতাম না? তুমি খবর পেতে না?'

রাম সিংগিও খুব চিন্তিত। বলল, 'অসাগর ধান রে! গেলে আমারও গেল! তোরা যাবি বলছিস, তা বোট মারা পড়বে না ত?'

মাতং গভীর হতাশায় বলল, 'বাবু! বাথান সরালে সদর হতে খবর পেয়ে। একবার বললে না, তাতে ডোমপাড়া ডুবল।'

'বুঝি নাই রে বাপ।'

'বোট মারা পড়বে বলে মনে লেয় না। জল যেমন হেলা-দোলা নাই। নিচ হতে ঠেলে কে উঁচা করে। কোন দেশ বাঁচাতে মোদের ভাসায়?'

প্রশ্নটি বেলাটির মাতং তিওর করে, উত্তরটির সঙ্গে বহু দপ্তর, ব্যক্তি, একাধিক রাজ্য ও রাষ্ট্র জড়িত। রাম সিংগিও সব জানে না। নানা কথা মনে হয় ওর। সদরের খবর, জল ছাড়া হবে। রাম সিংগি জানত, বাথান সরাল। সরকার খবর ঘোষণা করে মানুষজনকে ডাঙা জায়গায় আসতে বলতে পারত, বলে নি। সরকারের কাছে "বন্যাগ্রস্থ" ঘোষিত না হওয়া অবধি বেলাটি কোন অস্তিত্ব নয়। রাম সিংগি তা বলতে পারে না। সেই বেলাটি। এবং দুর্গত ডোমরা সামনে বসে আছে। সরকার যদি ত্রাণে সাহায্য না দেয়, তাহলে সে গেল। এরাই খেপবে, এবং যে সাজুয়া জাতুধান, আহার বিনা কিছুই বোঝে না, সেই সকলকে নিয়ে বলবে, 'গোলার চাবি দেন।' এ রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা অতীতে রাম সিংগির দুবার হয়েছে। তিক্ত! "গোলার চাবি দেন" যদি বলে অত্যন্ত চেনা মানুষ, তাহলে সম্পর্কে ফাটল ধরে। কিন্তু তারপরেই সাজুয়া প্রত্যহের মত অতীব নর্মাল ব্যবহার করেছে। বলেছে, 'বাগান সাফ করলে বাগাল নিব। ঘরে শলা নাই।' নানা মিশ্রিত চিন্তা ধাক্কা দেয় রাম সিংগির মনে, এবং সে বোঝে, চরের সতেজ, সুপুষ্ট ধানগুলির

জন্য সে উদ্বিগ্ন। বলে, 'নৌকায় যা। চিড়া-গুড় লয়ে যা। জলের গতিক কে জানে? যদি আজ না ফিরা হয়?'

ভাগীরথী উঁচু হচ্ছে, উঁচু হচ্ছে। জলে কচুরিপানা, ঘরের চাল ও খুঁটি, মরা গরু। সাজুয়া বলে, 'কুনো গেরাম খেয়ে আসতেছে বুঝি ইঃ। লতুন খ্যাড় গো চালে, লতুন খুঁটি। কার সাধের ঘর গো।'

মাতং জল দেখে। বলে, 'ই লতুন বান! জল ছাড়ে। দেশ ভাসায়।'

সাজুয়া বলে, 'হুই পদ্মা, হেই ভাগীরথী। মাঝে এত্‌টুনি ফারাক, তিরতির করে। যদি উ ফারাক ভাসে, তবে?'

'বাপ-ঠাকুরের কাছে যাবি শালা। ফারাক ভাসলে, পদ্মা-ভাগীরথী হাত মিলালে জেলা থাকবে? শালা জানে পেটে খেতে, আর ফাল কথা বলতে।'

সাজুয়া চুপ করে যায়। গেরুয়া জলরাশির ওপর দিয়ে কালো নৌকোটি যায়। ভাগীরথীকে দেখে মাতং বা সাজুয়া বা গগন বা ঈশানের এখন "মা" মনে হয় না। ফরাক্কার জল পাবার পর এ এক নতুন ভাগীরথী। নদীর চেহারা নেই তার, চেনা চেহারা। নদীর পুরনো চেহারায় গ্রীষ্মে চড়া পড়ত, তিন-চার ধারে জল বইত, তাতে ডুবজল-সাঁতার জল থাকত। পাড়ে ধরে নামলে জল। বর্ষায় টাবু-টুবু। এক সময়ে বর্ষায় বড় নৌকো চলত, কলকাতা থেকে স্টীমার আসত।

এখনকার ভাগীরথীর চেহারা কানালের মত। সম্বচ্ছর জল। দু'-পাড় ছুঁয়ে। জল ভাল, খুব ভাল, শুধু এ জলে নদীর চেহারা স্বভাব নেই। আকাশে জল নেই, নদীতে বান, কে কবে শুনেছে?

দূর থেকে চর চোখে পড়ে। গেরুয়া জলের বুকে এক খণ্ড পান্না ভাসছে। সাজুয়া বলে, 'জয় মা! গঙ্গা পূজায় ডালা দেব।'

চরটি অক্ষুণ্ণ আছে দেখে ওর আর মাতংদের চোখ দিয়ে অপ্রতি-রোধ্য আবেগে জল ভরে আসে। মাতং এক আঁজলা জল নিজের ও অন্যদের মাথায় ছেটায়। বলে 'দোষ নিয়ে না মা! কটু কথা বললাম কত!' বলে, 'পূজায় সবে ডালা দিব।'

চরটি কাছে আসে, ক্রমশ। ধান বোনার সময়ে রাতে থাকতে হত বলে মাচাঙে চালা। ধান পাকলে পাহারা দিতে পাখির হাত থেকে—চালাটি কাজে লাগবে। ওরা মাচাঙের নিচে যায় ও দাঁড় দিয়ে পেটায়। সাপ নেই। মাতং বলে, 'জলের টানে সাঁপ অন্যত্তর যেছে।'

ওরা মাচাঙের নিচে বসে। চিড়ে ও গুড় খায়। তারপর সাজুয়া মাচাঙে ওঠে। চেয়ে দেখে। মাতং বলে, 'কি দেখিস?'

'জল।'

'কতদুর দেখা যায়?'

'সাজাখালি।'

'তবে ভয় নাই।'

'কত ঘরের চাল, পানা কত রে!'

'খেতে খেতে আসছে।'

'উনিও জাতুধান হল?'

'হয়। নদী রাক্ষসী হয়।'

নেমে এসে ওরা খেতের আগাছা খানিক উপড়োয়। তারপর সাজুয়া বলে, 'আমি থাকি। খেয়েছি, এখন কষ্ট নাই আর। তোমরা খেয়ে সকলারে লয়ে এস। ঘাস না উঠালে ধান যাবে।'

'নৌকা আছে তত? চর ফেলাল, হেঁটে আসব, তা ফরাক্কা হতে সকল বিস্মরণ।'

'মেয়েছেলা লয়?'

ওরা সাজুয়াকে রেখে চলে আসে। বিড়ি চেয়ে নেয় সাজুয়া। হেঁকে বলে, 'ফিরা নৌকায় চলে এস হে! এই বানে মদনরা নৌকা নিবে না।'

'আসব।'

ওরা চলে আসতেই সাজুয়া মাচাঙে শুয়ে পড়ে। খুব নিশ্চিন্ত লাগে ওর। বান হোক, গ্রাম ভাসুক, চর তো ডোবে নি? ঘুমিয়ে পড়ে ও।

ওদের যেতে বেলা গড়ায়। ফলে বিকেলে ওদের না দেখে ওর তেমন উদ্বিগ্ন লাগে না। আজ পারে নি। কাল আসবে। ধান ওদেরও। এখন আগাছা ও ঘাস না কুঁদরালে ওদেরও ক্ষতি। সাজুয়া কল্পনাপ্রবণ নয়। ফলে আদিগন্ত ভাগীরথীর বুকে একা ও চরের মাচাঙে বসে আছে, এ উপলব্ধিতে ওর মনে কোন ভয়ের অনুভূতি জাগে না, দৃশ্যটির অমানুষী ও আদিম সৌন্দর্য ওকে স্পর্শ করে না। বিড়ি টেনে ও সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়ে। শুক্লপক্ষে চাঁদ ওঠে। আকাশে ছেঁড়া মেঘ। মৃদু জ্যোৎস্নায় ভাগীরথী আকাশপানে ঠেলে উঠতে থাকেন সোজা।

সাজুয়া ঘুমের মধ্যে ধাক্কা খায়। প্রথমে মৃদু তারপর জোর ধাক্কা। না, গায়ে ধাক্কা নয়, মাচাঙ নড়ছে। ওরা এল না কি? উঠে বসে ও, এখন চোখ কচলে চেয়ে দেখে চন্দ্রালোকিত ভাগীরথী ওর চারদিকে। বিমূঢ়, আতঙ্কবিহ্বল সাজুয়া আবার চেয়ে দেখে। ধান নেই, চর নেই, জল ওর মাচাঙের খুঁটিতে ধাক্কা মারছে। চালে উঠবে? চাল তো তেমন পোক্ত করে বাঁধা হয়নি? মাচাঙের খাঁচাটি আঁকড়ে ধরে ও, চোখ বোজে। বউ নয়, মা নয়, ছেলে নয়, নিজের জন্যে ভীষণ কষ্ট হয় ওর। কিছুই পাওয়া হল না জীবনে। সব সাধ অপূর্ণ রেখে চলে যেতে হল। জল এখন মাচাঙের খুঁটি থেকে খাঁচাটি খসিয়ে নিল। জলে পড়ে তবে সাজুয়া বুঝতে পারল, ভাগীরথীর বুকের নিচে ভীষণ তোলপাড়। গুমগুম শব্দ হচ্ছে অতলে। ওপর পানে চাইল ও। নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত চন্দ্রমা। মাচাঙের খাঁচা জড়িয়ে সাজুয়া চাইতে থাকল। একটা গাছ ভেসে আসবে না? একটা শক্ত পোক্ত চালাঘর? তারপর ওর আতঙ্কবিহ্বল চোখের সামনে একটা জলের দেওয়াল ছুটে এল। আসতে আসতে, জ্যোৎস্নার আলোয় লোনা জল যেন দাঁত বের করে হাসল।

চর ভেসে গেছে, এ কথা জানা যায় ভোরে। সাজাখালিতে ত্রাণ বোট যেতে থাকে যখন। পুলিসের ঘাট-চৌকিতে জল ঢুকে পড়ার

কারণে বেলেটি এখন ত্রাণ-কেন্দ্র হয়। রাম সিংগিকে অশেষ ব্যথা দিয়ে সরকার, উদ্ধার ও ত্রাণ কাজের জন্যে আলাদা শিবির ফেলে। জওয়ানরা উদ্ধার ও ত্রাণ-দান চালাতে থাকে। রাম সিংগি চর ডুবতে পয়লা ব্যথা পায়। দ্বিতীয় ব্যথা পায় রিলিফের গম-চিড়ে-গুড়-কাপড় ইত্যাদির হেফাজতী না-পেয়ে। তারপর ভয় খায়, বি ডি ও যখন খিঁচিয়ে বলেন, 'নিজের গাইবলদ সরালেন খবর পেয়ে। খবরটা দিতে পারেন নি? সে খবরও সরকার দেবে? সরকার মানে সরকারী আমলা শুধু? আমি জানলে নিশ্চয় জানাতাম। বান-বন্যা বলে কথা! জেনেও চেপে গেলেন?'

রাম সিংগি সকাতরে বলে, 'সে ত হয়েই গেছে। চেল্লাচিল্লি করিয়েন না সার। এ ডোমগুলা শুনলে ছিঁড়ে খাবে। তাতে আমাদের সাজুয়া, চর মুনতে গিয়ে ভেসে গেছে, তিওররা কান্‌তে লেগেছে।'

'আপনার চর-জমি ত?'

'আজ্ঞা।'

রাম সিংগি আরো কাতর হয় ও বলে, 'মোটরবোট নিয়ে ঘুরতে ওকে জানি তোলে।'

'তার ওপর তো কারো রিষ নেই যে দেখলেও তুলবে না। এই জলের তোড়, সে কি আছে?'

নৌকো ঘুরতে থাকে জলে। এখন পরের পর গ্রাম ভাসছে। বেলাটি ব্লক ডিকলেআর্ড বন্যা প্লাবিত ব্লক। ত্রাণ করে আনা হয় যাদের, তাদের মধ্যে মাতংরা, সাজুয়ার বউ ও মা বৃথাই খুঁজে খুঁজে ফেরে সাজুয়াকে। অবশেষে জানা যায়, নদীর মাইল তিনেক আগে, একটি গলিত শবদেহ দেখা গেছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। প্রসারিত ও স্ফীত হাতে লোহার বালা।

এখন আর সন্দেহ থাকে না কোন। সাজুয়ার বউ দাপাদাপি করে করে কাঁদে। মা ঘন ঘন মূর্ছা যায়। মাতংরা মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। তারপর মাতং নিশ্বাস ফেলে বলে, 'সকলি জানা গেল যখন,

সে যখন নাই, তখন রীতকরম কত্তে হবে সাজুয়ার মা! মাতং রইতে তোমরা মরবা না। এখন উঠ।'

'কি কত্তে উঠব, অ দেওর!'

'বউরে বলা যায় এমন কথা? উঠ, তার খ্যাড়ের ঠাকুর দাহ কত্তে হবে। ছরাদ আছে। আহা হা রে, আমরা বলাছি রাক্ষস! বামুন নাম দিল জাতুধান! আহা হা রে, দলমলা ছেলে, কুন রিষ জানে না গো! ডোমপাড়ায় জল, তাতে কাঁধে বয়ে বাছুর উঠাল ডাঙায়! এখন আমি মরব, বুড়াটা, না জোয়ানটা গেল!'

কেনে রেখে এল তারে, অ দেওর! সে ত গোঁয়ার হাবাটা ছিল! কেনে বা তার কথা শুনলে?

'সাজুয়ার মা! সে দুস্কে মোর বুক ফাটে। কে জানে বল, এমন হবে? উঠ উঠ, দাহ আছে, ছরাদ আছে, জ্ঞাতভোজন আছে, তার গেঁদাটার অমঙ্গল হবে নাল্যে।'

'কোথা হতে হবে?'

মাতং ভীষণ ক্রোধে বলল, 'রাম সিংগি বাবু দিবে? জল আসবে জেনাছিল, কারেও বলে নাই? মোষের কথা ভাবল, মানুষের কথা ভাবে নাই?'

চার দিকে বন্যাতাড়িত মানুষ। বেলাটি এখন মানুষে থইথই। তিওররা খড়ের পুতুল দাহ করল। তারপর রাম সিংগির কাছে গেল। মাতং, বলল 'এই বান-বন্যা তোমারে ছুঁল না বাবু! সরকার সকল দিতেছে। মোদের সাজুয়ার লেগ্যে তুমি দাও। লয় ত খারাপ হয়ে যাবে।'

রাম সিংগি তার গ্রামীণ ও অন্ধ মানসিকতায় মাতংয়ের ক্রোধকে যথার্থ মনে করল ও বলল, 'দিব। দিব না কেন? সরকার ভাসাতেছে তোরাও ভাসাতেছিস, বান ত আমি ডাকা করেছি, লেঃ, কি লিবি, লে। তোদের পিছনে বড় গিন্নি। তার দুধের টাকা সুদে খাটায়।'

মনিব্যান বলল, 'ই চাল তুমি লিখবা না। ওরা রুখলে ধান কাটতে পুলিস আসবে। আর হাংনামা কর না।'

'আর করি? মন্দ করলে বি. ডি. দেখে। ভাল করলে দেখবে? ভালর দিন নাই। সে আমলে বাপ আকালে গোলা খুলে রায়সাহেব খেতাব পায়।'

'সাজুয়ার ছরাদে চাল দিবে, তাতে তুমি খেতাব পাবা না?'

'খেতাব এখন নাই। ই বেটারা সামনে "শালা" না বললে সেই জানবে বাপের ভাগ্য। বানে জগৎ ডুবায় ছরাদ।'

চালের বস্তা এনে মাতংরা সাজুয়ার মাকে দিল। বলল, 'আর তিনদিন। তা বাদে আমরা তেল-তৈজস আনব। আমি রীতকর্ম করা দিব। লাও, লোহা রাখ। বউয়ের চুলে বেঁধে দিবে।'

চালের বস্তার গায়ে হাত বুলিয়ে, যেন ক্ষুধাকাতর, সদাই অন্ন-লোভী সাজুয়ার স্পর্শ পেয়ে মা ও বউ ঘুমোল। দুঃখের দিনেও ঘুম আসে, ঘুম এল। মা বলল, মাতং দেওর ছিল বলে ত্যাত চাল! নইলে উ হারামি দিত?'

বউ বলল, 'ছরাদ হলে চলে যাব ধামনাই। তুমি ঘর দেখবা, আমি ভাজদের সঙ্গে মাঠে যাব। সেথা বিটিছেলা মাঠে খাটে।'

'তাই যাব। বান না হতে আকাল আসবে। বাবু আর কারে সাজুয়ার ভাগ দিবে লিয্যস। মানুষ এখন পোকপতং, অসাগর মানুষ! বাবাঃ, ত্যাত মানুষ কোথা ছিল? এত হ্যাচাক জ্বলতে দেখি নাই, ত্যাত মানুষও দেখি নাই।'

'চরের দাংগায় তুমি রাঁড় হলে, চর ভেসে আমি। আর রব না হেথা।'

'নে ঘুমা।'

দুজনে জড়াজড়ি করে ঘুমোল।

ঘুমের মধ্যে মা আগে শোনে, দরজার ওপারে কে বিপন্ন গলায় ডাকছে, দরজা খোল!

ধড়মড়িয়ে উঠল মা। কে ডাকে? সাজুয়া? মৃত্যুর পর তার প্রেত?

'কে?'

'আমি মাতং হে, দরজা খোল।'

বউকে ডেকে তোলে মা, তারপর দরজা খোলে।

বউ ডিবরি জ্বালে।

মাতং, সঙ্গে সাজুয়া।

'ই কি দেওর?'

'মা, আমি!'

'তুই!'

'আমি!'

'মরিস নাই?'

বউ ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে ও ডুকরে কেঁদে ওঠে। মাতং ধমক দিয়ে বলে, 'কেন্দ্য পরে। আগে ওরে চাল দাও, চিবায়ে জল খাক। মরে এসেছে।'

'মরে নাই ত। মরে নাই।' মা হেসে কেঁদে সাজুয়ার গায়ে হাত বোলায়, 'তুই!'

'হুই ভেসে এট্টা গাছ পাই! তাতে সাঁপ কি! লরে-লাগে ভেসে ভেসে সেই জিয়াগঞ্জ! সেথায় মড়া হয়ে পড়েছিলাম। উঠাল সেপাইরা। তা বাদে ধুম জ্বর। ইঞ্জিশান, অষুদ দে, চাল দে!'

বউ চাল ও জল দেয়। সাজুয়া খায়। জল খেয়ে বলে, 'হাঁটতে হাঁটতে—হাঁটতে হাঁটতে—মাতঙের ঘরে আগে ডাকতে বুড়া ভূত দেখল।'

মাতং গলা সাফ করে বলল, 'অ্যানেক ছরাদ হয়ে যেল্‌ছে রে! সে অ্যানেক কথা।'

'ঘরে চাল এত?'

'শালা চাল দেখতেছে! শোন্‌ বেটা!'

মাতং ওকে সব কথা বলে। ভয়ে ভয়ে বলে। জলে ভেসে যাবার অভিজ্ঞতা, মরতে মরতে বেঁচে ওঠার অভিজ্ঞতা, তারপর বেঁচে ফিরে এসে নিজেকে মৃত জানার অভিজ্ঞতা, সাজুয়ার মাথা না খারাপ হয়ে যায়। কম কথা না কি ? মা ও বউ, অপরাধীর মত বসে থাকে। সাজুয়া ওদের পেটায় যদি ?

সব শুনেমেলে সাজুয়া বলে, 'দাঁড়াও বুঝে লই। আমার খ্যার ঠাকুর দাহ করলা ?'

'সি তোরে শুদ্ধ করে লিব।'

'ছরাদে জ্ঞাতভোজনের চাল আনলা ?'

'কালই ফিরত দিব। লইলে বেটা বলবে, তোরা সাজস করে ই কাজ করছিস।'

'লাঃ !'

'কি বলিস ?'

'চাল ফিরত দিব না।'

'তবে ?'

সাজুয়া ওদের অবাক করে হাসে! দমকে দমকে হাসে। বলে, 'উঃ আমি সেথা আছি। তোমরা খ্যাড়ের ঠাকুর পোড়ালা, ছরাদের চাল আনলা…'

'তোর মারে বলাছি মাতং রইতে তোমরা মরবা না। আমরা তোর সামাজ লই ?'

মাতংয়ের পায়ের ধুলো খায় সাজুয়া। বলে, 'তা জানি হে বুড়া।'

'তবে ?'

'দেখ! সবে বল জাতুধান, আমার বুদ্ধি লাই। বুদ্ধি আমার হলছে হে এট্টা। আমি যে এসাছি, জীয়ন্তে ফিরাছি, তুমি ভিন্ন কেও জানে না।'

'তাতে ?'

'বুঝলা না ?' আবার হাসে সাজুয়া, মাতংয়ের গালে আঙুল দিয়ে চুমকুড়ি খায়। বলে, 'চালের বস্তা লয়ে এদের লয়ে আমি ধামনাই

চললাম। তুমি বলবা, ওরা কোথা গিছে, মা বউ, তা জান না। বলবা, বুঝি ধামনাই গিছে। সেথা ছরাদ করবে।'

'রাম সিংগিরে কি বলব?'

'কিছু বলবা না। বান শুকালে আবার চলে আসব। বলব জাতুধান আমি, তাতেই ভাগীরথী ফিরায়ে দিল। বলল, এখনো অনেকদিন দানা আছে তোর।'

'এ চাল?'

সাজুয়া হাসে। বলে, 'আমি তো রাক্ষস, জাতুধান, আমার ছরাদের চাল আমি খাব না? আরে এমন ছরাদ হয় নাই। যার ছরাদ সে এসে ভাত খায়, কেউ এমন ছরাদ দেখেছে?'

'তাই কর্ গা। আমি কারেও কিছু বলব না। কিন্তুক কাজটা কেমন হল বল্? শুদ্ধি হল না, দাহ হল, দেও-দেবতার রিষে পড়বি।'

'পড়লে পড়ব। পেটে ভাত রলে বুড়া, সকল দেবতার রিষ বের্থা যায়। মা চল্, বউ, গেঁদাটা উঠা আঁধারে পলাতে হবে।'

নিজের শ্রাদ্ধের চালের বস্তা কাঁধে জাতুধান অন্ধকারে পালাতে থাকে। ধামনাই অনেক দূরে। পালাতে পালাতে মনে হয়, ও ভাগীরথীর চেয়েও শক্তিমান। এই বান-বন্যা থেকেও ফায়দা তুলে নিল।

অসম্ভব দর কষছিল লোকটা, চোখের দৃষ্টি ছিল এমন, যে ধরা-বাঁধার বাইরে। বহু কাকুতিমিনতি করেও ওকে ছোঁয়া যাচ্ছিল না যেন। দিলীপ বুঝতে পারছিল বন্যা স্বাভাবিক মানুষগুলিকে অমানুষ করে রেখে গেছে। দিলীপের স্ত্রী ও মেয়ে পাতুল গ্রামে জলবন্দী পড়ে আছে, এ কথায় লোকটি বিচলিত হচ্ছে না। দিলীপ ওর মনুষ্যত্ব জাগাতে অনেক চেষ্টা করছিল।

লোকটি হঠাৎ বলল, কেন দম ছুটাচ্ছেন ? আঁ ?

—দম ছুটচ্ছি ?

দিলীপের সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল সে বলল, কেন এত কথা বলা হচ্ছে তা বুঝছ না ?

—দেখেন, বেশি কথায় দম লাশ, ম্যাজাজ লষ্ট। আমার কথা শুনেন।

—বল, তুমিই বল।

—রেডিওতে শুনেছেন, কাগজে দেখেছেন, পাতুল যাওয়া যায় না। হেথাক্ এসেও তাই দেখছেন, পাতুলে সকলে জলবন্দী। আমি ভাল কথা বললাম, পাতুল বাদে নামুজল, তা পেরালে টিশান, সেথা চলে যাবে সবাই। তা একবার চোখে দেখলেন নাই! কলকাতা হতে ফরাক্কা হয়ে এলেই দেখতে পেতেন ? আঁ ?

—তা ত যাইনি। এখন···

—তা পাতুল যাওয়া যায় না শুনেছেন !

—হ্যাঁ।

—আমি লয়ে যাব। যাওয়া যায় না এমন জায়গা নাই হে মাশায় যেতে চোলে সকল ঠাঁই যাওয়া যায়। তা আমি লয়ে যাব আপনারে, ডিঙা বেয়ে লয়ে যাব। যে নিবে সে টাকা হাঁকুড়েবে, আমি টাকা নিব না।

—আমারে দু কৌটা বেবিফুট্ দিবেন।

—কোথায় পাব ?

—আমি জানি ?

—টাকা নাও।

—নাঃ। টাকা নিব না।

দিলীপের সঙ্গের ছেলেটি বলল, না, টাকা নেবে না। ফুড নেবে, বেচে দেবে।

লোকটি ছেলেটির দিকে তেমনি চোখে চাইল এবং 'আকাশ নীল' বলার মত সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত সত্য বলার কণ্ঠে বলল,

—কে কিনবে ? খরিদ্দারের মেলা দেখছ ?

সামনে নিশ্চল ও আবদ্ধ জলরাশি। পাশে ও পেছনে ত্রাণ-শিবির। জওয়ানদের ক্যাম্প। এবং চলমান মানুষ। মানুষ হাঁটছে। বড় রাস্তার দুপাশে লক্ষজনের ভিড়ে সামিল হতে পারলে সাধুজীরা খিচুড়ি দিচ্ছেন, তা মেলে। বন্যার্ত লোকগুলি খুবই খচড়াই। ত্রাণিত হবার জন্য অনাদ্যন্ত কাল অপেক্ষা করে না। তিনচার দিন অনাহারী থেকেই গাছ থেকে ঝুপঝাপ পড়ে যায় জলে। অথচ দিলীপ ভাল করেই জানে, কাগজপত্র পড়ে জানে, গ্রামে অনাহারী থাকাটা কোনো ঘটনা নয়। শুকনো সময়ে যারা দিনের পর দিন অনাহারে থাকে, বান হলেই তারা তিনদিন বাদে দুর্বল হয়ে সাপে জড়াজড়ি গাছের ডাল থেকে জলে পড়ে উধাও হয়—খচড়াই নয় ? প্রশাসনকে শুধু বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলিই বিপদে ফেলছে না, এরাও। তারপর, যারা বাঁচছে, তারা ত্রাণিত হবার জন্যে অপেক্ষা না করে কোনো না কোনো মতে বেসরকারি লোকজনের ডিঙিতে নৌকোয় ডাঙায় চলে আসছে। এসে কি রকম ভূতেপাওয়া চোখে চলে যাচ্ছে সামনে, লক্ষ্যহীন সামনে। মামূড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, পথের ধারে সন্ন্যাসীদের খিচুড়ি, বহরমপুর শহর থেকে রুটি ও গুড় আনছে ছেলেরা।

দিলীপের মনে সবগুলি চিন্তাই জলে-ভাসা মরা গরুর স্ফীত লাশের

মত চলে যায় ভেসে। স্ত্রী ও মেয়ের জন্য অবোধ, দুর্মর ব্যাকুলতা থেকে যায়। কিন্তু মনের এ অবস্থায় দিলীপ বোঝে লোকটি সত্যি কথাই বলছে। এখানে রিলিফ নিয়ে ঝেঁপে দেবার সুবিধে কম। খদ্দের নেই।

দিলীপ নিশ্বাস ফেলে বলে, আনছি বেবিফুড। বহরমপুর যেতে আসতে ঘণ্টা চারেক। তোমাকে কোথায় পাব? তুমি থাকবে ত?

—হ্যাঁ। কিসে যাবেন?

—জীপে। কাদের জীপ যায় দেখি।

একটি জীপ মেলে। বহরমপুর চলে গিয়ে বেবিফুড কিনে আনতে পাঁচ ঘণ্টা যায়। হেমন্তের সন্ধ্যা। লোকটি দিলীপকে নিয়ে হাঁটতে থাকে। বুনিয়াদী স্কুলের জলে এখনো ডোবা একতলা বাড়ির ছাতে ওর ইম্প্রুভাইজ্‌ড্‌ ভেলা। দরজার পাটা দড়িতে বেঁধে তৈরি।

চাপেন। লোকটি বলে।

নিস্তরঙ্গ জল। দুর্গন্ধ। লোকটি লগি দিয়ে মরা ছাগলটি ঠেলে দেয়। ওর চোখ এখনো অত্যন্ত দূরে অবস্থিত। দিলীপের হঠাৎ মনে হয় ওর চোখ দুটি মারা গেছে। চোখের মৃত্যু যার ঘটেছে, সে লোকের অন্তরে পৌঁছনো বড় কঠিন। জল সরু হয়। সহসা স্রোত। ভেলাটি মোদো মাতালের মত টলে টলে চলে। দুপাশে নিমজ্জিত বাঁশ গাছ। ঝুপঝুপ শব্দ হয়।

— সাপ। জলে পড়ছে।

—এ জলে স্রোত কেন?

—খাল এটা বটে।

—খাল?

—হঠাৎ দিলীপের ভয় হয়। নিজের জন্য। লোকটা কি জানে দিলীপের প্যাণ্টের ভেতর-পকেটে টাকা আছে? ওকে মারবে না ত? মারলে দিলীপ কী করবে?

লোকটি লগি ঠেলে কী পরখ করে দেখে ও দিশা ঠাওর করে

আবছা আঁধারে জলব্যাধের মত নিশ্চিতে ডান দিকের মোড় নেয়। এবার লগি মাটিতে বারবার ঠেকে ত দিলীপ আশ্চর্য হয়ে বলে, জল তো কম।

—হ্যাঁ।

—পাতুল কত দূর।

—মামুদপুর ইটা। তা বাদে পাতুল।

—মামুদপুর।

—হ্যাঁ।

—বড় গ্রাম ছিল?

—তিনশত ঘর মানুষ ছিল।

—গ্রামের মানুষ··· ?

—দেখেন কেন? ঘর দেখেন?

জলে মুখ-থুবড়ে থাকা ঘরের পর ঘর। দুর্গন্ধ। লোকটি হাঁপায় ও লগি ঠেলে। মাঝে মাঝে ভূতুড়ে গাছ। দিলীপের হঠাৎ মনে হয় জলের ওপর একটা আলোর তীর।

—হোই পাতুল।

—আলো কিসের?

—হ্যাচাক্।

—হ্যাচাক্।

—ইস্কুলবাড়ি ডাঙায় আজ্ঞা, সেথা সকলা উঠেছে, বাবুরা হ্যাচাক জ্বালে।

—কেন?

—হোথাক্ সকলার খাওয়াদাওয়া।

—কিন্তু পাতুল···

লোকটি একই নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, আপনারে ত বলা করেছি মাশায়, পাতুলে কিছু হয় নাই। পাতুলে গিছে শুধা দুসাদপাড়া। তাও কেউ মরে নাই।

—জল ওঠেনি ?

—জল উঠেছে, ঘর ডুবেছে, জল নামতেছে, নামবে। দুসাদপাড়ায় ঘর ধসে গিছে।

-- মানুষজন ?

—পাতুল বাদে নামুজল, তা পেরালে টিশান। সবাই টিশান সাইডে গিছে। পাতুলে আপনার ?

—মামাশ্বশুর বাড়ি।

— দেখেন কেন ?

ভেলাটি ভেড়ে এবং সহসা সামনের দোতলা বাড়ির বারান্দা থেকে হুইহুই শব্দ ওঠে। কয়েকটি ছেলে রেলিঙে ঝোঁকে ও চেঁচায়, কে ?

—ভবেন হে বাবুরা !

লোকটি হেঁকে বলে, দিলীপের দিকে চেয়ে বলে, ডাকাত-চোরে ভয় পায় তাতে চেঁচায়, তারপর আবার গলা চড়িয়ে হেঁকে বলে, একবার আসেন কেন ?

—দাঁড়াও ?

—কে, মাখনবাবু ?

—হ্যাঁ রে !

উদ্দিষ্ট ভদ্রলোক হাঁটু জল ভেঙে এগোন। দিলীপ বলে, আমি নামব।

—দাঁড়ান কেন ?

—নামতে দাও আমাকে।

—দেখেন কেন ?

দিলীপের এখন এ লোকটিকে খুবই দুর্বৃত্ত মনে হয় এবং ও চটি হাতে জলে ঝাঁপ দেয়। হাঁচড়ে পাঁচড়ে যখন হাঁটুজলে ওঠে, ওর একটি চটি হাতে থাকে। ভদ্রলোকটি এসে দাঁড়াল। দিলীপের হাত ধরেন ও মুখে টর্চ ফেলেন।

—আপনি ?

—আমি দিলীপ ভদ্র, হেম রায়ের ভাগ্নীজামাই, আমার স্ত্রী ··· আমার স্ত্রী আর মেয়ে এসেছিল স্ত্রীর মামাবাড়ি···রেডিওতে শুনি আমি ···দিল্লি থেকে ফিরেই আসছি···

—অ।

মাখন বাবু চিন্তিত হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকেন।

—ওরা··· ?

—হেমবাবুরা সপরিবারে তো ফরাক্কা হয়ে কলকাতা চলে গেছেন।

— চলে গেছেন ?

—হ্যাঁ, জল নেমে গেছে ও সাইডে। হাঁটু জল। আমাদের ছেলেরাই ত ওঁদের পৌঁছে দিয়ে এল ফরাক্কা।

—কবে ?

—কাল ?

—পৌঁছয় নি ত ?

—কাল ত ট্রেন চলে গিয়েছিল। আজকে রওনা হয়ে গেছেন। ওঁর ভাগ্নী ? তিন বছরের মেয়ে আপনার ?

—হ্যাঁ।

—তাঁরাও গেছেন।

—ওঁদের বাড়ি ?

—ওই তো। জল ঢুকেছিল, একতলায় এখনো জল। কিন্তু দোতলা তো ? কিছুই হয়নি।

—আপনারা ?

—গাঁ পাহারা দিচ্ছি। কোথায় যাব ? জলও নেমে যাচ্ছে-ফরাক্কাও যাওয়া যাচ্ছে, হেমবাবুরা চাল-ডাল-দিয়ে গেলেন, অক্ষয়-বাবুরা গুড় আর লবণ···

—অ।

স্ত্রী ও মেয়ে নিরাপদে আছে, খবরটা মস্তিষ্কে ঢুকতে সময় যায় দিলীপের। তারপরই মনে হয় তার ফেরা দরকার।

ওপারে পৌঁছতে পারলে কারো জীপ পাক বা না পাক, আট মাইল হেঁটে বহরমপুর চলে যেতে পারবে। বহরমপুর বন্ধুর বাড়িতে ওর ব্যাগ আছে। বহরমপুর থেকে কোনোমতে ফেরা যাবে। এসেছিলও তো বহরমপুর দিয়ে।

—আপনি কি নামবেন?

—না, ফিরেই যাই।

দিলীপ এসে আবার ভেলায় ওঠে। একটা চটি ফেলে দেয় জলে ভবেন জলে থুথু ফেলে ও বলে, ফস করে উঠে বসলেন? আঁ?

—কেন?

—আনার কথা, যাবার কথা নাই।

—যাবার কথা। তুমি...তুমি.. মানুষকে বেঘোরে পেয়ে খিঁচে নেবার চেষ্টা শুধু!

মাখনবাবু হেঁকে বলেন, নিয়ে যাও ভবেন!

—থামেন বাবু।

—হ্যাঁ তোমার লক্ষ্মণ কেমন আছে?

—একই রকম।

মাখনবাবু পেছন ফেরেন ও জলে টর্চ ফেলে স্কুলবাড়ির দিকে হাঁটেন।

দিলীপ এখন নানা বিমিশ্র অনুভূতির আক্রোশে ফুঁসতে থাকে ও বলে, বল! কী দিতে হবে বল।

—টর্চবাতিটা।

—নাও!

ভবেন টর্চটি নিয়ে লুঙ্গির কোমরে গোঁজে। আবার ভেলার মুখ ঘোরায়। দিলীপ নামটা মনে মনে টুকে নেয়। একে কোনমতে হুজিমত দিতে পারলে হত। মানুষের দুঃখ দেখে গলায় পা দিয়ে প্যাঁচ কষে জিনিস নেওয়া।

নিস্তরঙ্গ আবদ্ধ জলে লগির জোরে ভেলা ঠেলে চলা। ভবেন

মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মোছে। জল, জল, ভাসমান শব, ঘরের চালা ও খুঁটি। দিলীপ আর উষ্মা চেপে রাখতে পারে না।

—মানুষের বিপদ দেখে তোমার...অমানুষ!

—কী বললেন?

—অমানুষ!

ভবেন লগি মাটিতে ঠেকায়। তারপর বলে, মাথায় বাঁশ মেরে ফেলে দিব মাশায়, মুখে মুতে দিব। তোমার কোন্ বাবু সুমুন্দি জানবে, আঁ? বললাম পাতুলে কিছু হয় নাই, শুনলে না। বললাম দাঁড়াও টু'খানি, মাখনবাবুরে শুধাতে পারতা, জলে লামলে। বউ-মেয়ের খবর নিবা, পাতুলে আসবা, তা দুটা বেবিফুট্ কিনেছ বলে ভাব জমিদারি দিলা। আঁ! লাম আমার লা' হতে।

—এই, এই! কী কর?

—লাম শালা!

—এই! না না, ঠেলো না, ঠেলো না, আমি সাঁতার জানি না।

—জান না! তবুও যার লা চড় তার মুখে মুত, আঁ? বাবু! শহরের বাবু! বউ মেয়ের টানে জল ভাঙলা, লয়তো তোমরা, বাবুরা, হোথা বসে ডাণ্ডা ঘুরাও! আজ একমাস হয় দেখতেছি!

—ভুল হয়ে গেছে ভাই! মাথার ঠিক ছিল না...

ভবেন এখন অমানুষী উল্লাসে বলে, ইটা মামুদপুর, জানলে? মা-মু-দ-পু-র! সেথা আমার লা, সেথা আমার ঘর ছিল। ঘর গিছে, পরিবার-মেয়ে-পিসী-ভাই সব গিছে! তবুও আমরা মানুষের মুখে মুতি না। অ-মা-নু-ষ! যত মানুষ তোমরা।

দিলীপ অসহায়, অসহায়। লজ্জায়, গ্লানিতে ও চোখ দিয়ে জল পড়ে। ভবেন আবার লগি ঠেলে।

মামুদপুর। খাল। স্রোত। আবার নিশ্চল আবদ্ধ জল। জলের বুকে তারার ছায়া। গভীর, গভীর জল। স্কুলবাড়ির ছাত।

ওরা নামে। এখন শোনা যায় উঁ-উঁ-উঁ-উঁ কান্না।

—লক্ষ্মণ!

ভবেন ডাকে। উত্তরে কান্না জোরদার হয়। ভবেন ক্ষমাহীন আক্রোশে বলে, জ্বোরো ছেলে ধরে গাছে ছিলাম বলে আমি একা…

এখন দিলীপ দেখে খোলা ছাতে এক কোণে পোঁটলা-সদৃশ গুটি-মেরে পড়ে-থাকা একটি শিশু! তারপাশে একটি কলসি। সহসা ও তৃষ্ণায় আকুল হয় ও বলে, শোন!

—কী? চলে যাও এখন।

—তোমার ছেলে?

—যাও বাবু।

—একটু জল দেবে?

'জল' বলতেই ভবেন জন্তুর মত চেঁচিয়ে ওকে থামাতে যায়, দিলীপ বুঝতে পারে না কিছুই এবং শিশুটি ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে ওঠে ও ভীষণ আর্তকণ্ঠে চেঁচায়, জল বলল কে? জল নয়, জল নয়, জল নয়!

ভবেন ছেলেকে চেপে ধরে বুকে এবং সম্পূর্ণ অন্য গলায় বলে, না বাপ! জল তো বলে নাই বাবু! জল কুথা? জল নাই লক্ষণ, জল কুথা? জল শুনলে তুমি ডরাও বাপ, জল তো বলে নাই বাবু! জল তো বলে নাই!

জল শব্দে শিশুটির প্রতিক্রিয়া দেখে তবে দিলীপের মনে বন্যা শব্দ, অ্যাবস্ট্রাক্‌শন—কাগজের খবর—রেডিও সংবাদ থেকে মুহূর্তের জন্যে সত্য হয়, মূর্ত হয়। মুহূর্তের জন্যে জল-পচা লাশের পূতিগন্ধ দিলীপকে অধিকার করে। অস্বস্তি। অস্বস্তি। নিরাপদ জীবনে ফিরে যাবার সময়ে এ অস্বস্তি সঙ্গে থাকলে কাল কেমন করে দিলীপ বউ ও মেয়েকে আদর করবে?

দিলীপ ক্যাম্পগুলির দিকে ছুটতে থাকে। ভীষণ ভয়ে।

বেহুলা

নদীটির নাম বেহুলা, গ্রামটির নাম বেহুলা, ব্লক ইরফানপুর, ব্লক আপিস—হেল্‌থ সেণ্টার—কৃষি সমবায় আপিস, সবই ইনফানপুরে; বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে আড়াই ঘণ্টা ট্রেনে গেলে ইরফানপুর স্টেশন। সেখানে নেমে স্রেফ হেঁটে যেতে হয়। শীত গ্রীষ্মে ধানখেতের আল বা খেতের মাঝের হাঁটা পথ ধরে যাওয়া চলে। বর্ষায় পথ অগম্য। তখন কাদা। পিছল এটেঁল কাদা। গ্রামের লোকেরা বলে, কাঁদতে কাঁদতে বেউলো ঝাও, কাঁদতে কাঁদতে এসো। এখানেই আসে বসন্ত কুমার। হাফকিন ইনস্টিটিউটএ ছিল ও। বাঙালী ছেলে। অপুষ্টি-জনিত ক্ষয়প্রাপ্ত, প্রতিরোধহীন মানব শরীরে কালাজ বা সাধারণ করাইত সাপের বিষক্রিয়া ওর রির্সাচের বিষয়। সেই জন্যেই ও এখানে আসে, ২৪ পরগনার এই গণ্ডগ্রামে। এখানে অপুষ্ট, ক্ষয়প্রাপ্ত, প্রতি-রোধহীন মানব শরীর ও কালাজ অ্যাবাউন্‌ডিং। গ্রামাঞ্চলটি খুবই উর্বরা কালাজ সাপ আবাদে। সমগ্র অঞ্চলটিতে শীর্ণ ও বুভুক্ষু মানুষের ফলনও প্রচুর। এই দুই উর্বরতা বৃষ্টি-বন্যা-খরা সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ থাকে। কালাজ এ অঞ্চলে শিয়ড়চাঁদা বা শিকড়চাঁদা নামে খ্যাত। কালাজের দংশন জনিত মৃত্যুও এখানে প্রচুর।

"কালাজ বা বাংগেরাস ক্যেরুলিয়ুস ভারতে সর্বত্র প্রাপ্ত। সমভূমিতে। ইস্পাত নীল উজ্জ্বল চামড়ায় জোড়ায়-জোড়ায় সাদা সরু ডোরা। দৈর্ঘ্য ১৫০০ মিলিমিটার। পুরুষরা দীর্ঘতর। সাপটি নিশাচর। গোখরোর পরেই কালাজের কামড়ে সর্বাধিক লোক মরে। পুরুলিয়ায় 'ডোমনাচিতি' নামে এ পরিচিত। সেখানে প্রবাদ, যদি কাটে ডোমনা ডেকে আন্‌ বাম্‌না। অর্থাৎ মৃত্যু অনিবার্য। শবাচারের জন্যে ব্রাহ্মণ ডাক। গোখরো বা চন্দ্রবোড়ার বিষ ১২ বা ১৫ মিলিগ্রাম

দেহে প্রবেশ করলে স্নেক ভেনম অ্যান্টিসিরামে কাজ হয়। কালাজের বিষ ৬ মিলিগ্রামের বেশি দেহে প্রবেশ করলে অ্যান্টিসিরামে কাজ হয় না। সাপটি শুকনো জায়গা ভালবাসে। যেমন, ইটের পাঁজা।"

বসন্ত কুমার বেহুলা গ্রামে এসে যে জোতদারের বাড়ির ঘর ভাড়া নিতে বাধ্য হয় (আর কারো পাকাবাড়ি বা বাড়তি ঘর নেই), সেই হৃদয় বা হেদো নস্করই কালাজ চাষ করে থাকেন। একদা তিনি ইটের পাঁজা করবার শুভসংকল্প করেন। কাজ শুরু করেন। লক্ষাধিক ইট পোড়ান। অতঃপর, চালানের খরচা সামলে লাভ থাকবে না বলে সংকল্প ত্যাগ করেন। উক্ত ইটপাঁজাগুলি, ইট পোড়াবার চুল্লিগুলি, কালাজ চাষের উপযুক্ত জায়গা। কিছু ইট এনে তিনি দোতলা সম্পূর্ণ করেন। তারপর ছেলের সঙ্গে কলকাতার মেয়ের বিয়ে হয়, এবং কুয়োতলায় বাঁধানো স্নানের ঘর করার দরকার পড়ে। এ বাড়ির বাঁধা মিস্ত্রি এসে মাপজোখ করে ও জোগান সহ ইট আনতে যায়। যায় হেঁটে ও তড়িঘড়ি ছুটতে ছুটতে প্রত্যাবর্তন করে। বলে, 'বাবু? সাপের চাষ করে ছেড়েচেন? ব্বাপো রে, ত্যাত কালাজ জন্মে দেকি নি। নমস্কার বাবু! শিয়রচাঁদা কাটলে রক্কে নি বাবু।'

হেদো নস্কর গর্জে ওঠেন, 'কৎ টাকার ইট রয়েচে, ঝানিস?'

'সে তুমি ঝানো বাবু। আমি পারবুনি।'

'ছিরি মালরে ডেকে হ্যাকাচ্চি।'

'ছিরি মাল কেন, ধন্বন্তরি গেলিউ হোথাক্ যাবু নি। শিয়রচাঁদার চাষ!'

শ্রীপদ মাল এ অঞ্চলে সাপের ওঝা, উইচ ডকটর এবং ছেলেদের ভোলাবার কাঠের ঝুমঝুমি বানানো ওর শখ। বর্তমানে সে গ্রামে নেই। শ্বশুরের দেওয়া আধ বিঘা জমির তদন্ত করতে বাদায় গেছে। ফিরে এসে ও সরজমিনে তদন্ত করতে যায় ও এসে বলে, 'করচেন কি? ওই অত ইট, গেরামের মদ্দি, এ ঝে মানুষমারা কল। একে শালার সাপের উৎপাতে মানুষের নিস্তার নি?'

'তুইও বলছিস ?'

'হেঁটে হুঁটে দেকে আসুন।'

হেদো নস্কর তড়িঘড়ি কলকাতা থেকে কার্বলিক অ্যাসিড আনান, ও স্বগৃহ সুরক্ষিত করেন! কিন্তু গ্রামটিতে কালাজ দংশন জনিত মৃত্যু হতে থাকে। মাসে একজন-দুজনকে সাপে কাটে। শ্রীপদ সব কেস্ নেয় না। না নিলে বাঁধন দিয়ে ইরফানপুর হেল্‌থ সেণ্টারে পাঠায়। হেল্‌থ সেণ্টারটি দেখলে মনেও হয় না, কলকাতা এত কাছে। ডাক্তারের সম্বল কিছু সাল্‌ফাডায়াজিন, এণ্টারোকুইনল ও কাশির মিক্‌স্‌চার। তিনি পটাশ পারম্যাংগানেটে ক্ষতস্থান বেঁধে শ্রীপদ প্রদত্ত বাঁধন পরীক্ষা করে দেখে বলেন, 'কলকাতা নিয়ে যাও।' শ্রীপদ সাধারণত সঙ্গে আসে। ও আড়বুঝো নয়। বিষধর সাপ জুৎ করে না কামড়ালে ও চিকিৎসা করে ও রোগী বাঁচায়। নইলে হেল্‌থ সেণ্টারে আনে। যা নিয়ম। যেহেতু জায়গাটিতে সর্পদংশন নিয়মিত ব্যাপার, সেহেতু এ সব হেল্‌থ সেণ্টারে সর্পদংশনের অব্যর্থ ওষুধ স্নেক ভেনম অ্যাণ্টিসিরাম কখনোই সরবরাহ করা হয় না। ডাক্তার রোগীকে কলকাতা নিতে বলেন। শ্রীপদ বলে, 'বাবু! ঘুমে এলি পড়চে, চোকে ঝাপসা দেকচে, কতা সরচে নি, ঘাড় ভাঙচে, কলকেতাতক ঝেতে হলি টিকবে না। টেন নি একন।'

রোগীর লোকদের বলে, 'কিচু হবার নয় হে। অধরের আশা নি। ওরে ঝমে ডেকেছে।'

'ইঞ্জিশান দেবে নে?'

'সাপের ইঞ্জিশান নি।'

'আসে নে?'

'না।'

রোগী খাটুলিতে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে লোকজন তাকে নিয়ে ফেরে। শ্রীপদ মাটিতে আঁকিবুকি কেটে বলে, 'ভোটের বচরে ভোট নেয় শালারা, ঝত ঝনা যায়, সবারে বলি, হেথা ইঞ্জিশান পাট্টে দাও।

সে ইঞ্জিশান পড়লি মানুষ ঝপ করে মরে নে। সব শালা মথুরা ঝেয়ে কেষ্ট হয়।'

ডাক্তার আবার স্নেক ভেনম অ্যান্টিসিরাম চেয়ে পাঠান। ফলে গর্ভনিরোধক বড়ি ও আরো সাল্‌ফাডায়াজিন পান। এগুলি তিনি, মরিয়া হতাশায় টাইফয়েড-নিউমোনিয়া-রক্তামাশা-ক্রিমি—সকল ব্যাধিতে দিয়ে চলেন ও কলকাতায় বদলি হবার চেষ্টা করেন। এখানে আসার পর তাঁর বিশ্বাস বেড়েছে, ভগবানই সর্বাবস্থায় মানুষকে বাঁচান। নইলে নিউমোনিয়ার রুগী গর্ভনিরোধক বড়ি খেয়ে সারে কি করে? বড়িগুলি নিশ্চয় দৈব আশীর্বাদ ধন্য।

সাপে কাটা রোগী একসময়ে মরে। শবকৃত্য করে আজও এরা মৃতকে বেহুলার জলে ভাসায় নদীটি নামের কারণে অভিশপ্ত। সর্পদষ্ট লাশ তাকে বইতেই হয়। বেহুলা যে হেতু মজে যাচ্ছে, সে হেতু বর্ষা বিনে তার স্রোতে গতি নেই। এমন ককিয়ে ককিয়ে সে লাশ বয়, যে মনে হয় জরতী বেহুলা নিরন্ন লখিন্দরের লাশ বইছে। প্রখর স্রোতময়ী সুবিশাল তামলীতে পড়ার আগে একটি বাঁওড়। সেখানে গিয়ে কলার ভেলাটি ঘুরপাক খায়, ক্রমে তলিয়ে যায়, তারপর গিয়ে ভেসে ওঠে তামলীতে।

স্বভাবতই শ্রীপদ এখানে, গ্রামজীবনে যথেষ্ট সমীহ পায়। কিন্তু যেহেতু কালাজে কাটলে, জুভ করে কাটলে কিছু করার থাকে না। কালাজ কাটলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, বাঁধন ছাঁদন পড়লেও, অ্যান্টি-ভেনম না দিলে আশা থাকে না। না দিলে আরো আশা কম। দেখে দেখে শ্রীপদ ভেতর ভেতর আস্থা হারাচ্ছে নিজের ওপর। ইঞ্জেকশান হেল্‌থ সেন্টারে এলে সেই সবচেয়ে খুশি হবে। ও গ্রাম ছেড়ে কোথাও গেলে ঘরে ঘরে শঙ্কার ছায়া নামে। শ্রীপদর নিজেরও মনে হয়, নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে রেখে যাচ্ছে এদের। ঘুমোতে ঘুমোতে বিছানার নিচে হাত পড়লে সাপে কাটে, উনোনের ছাই ঘাটতে সাপে কাটে, রাতে বাইরে বসতে সাপে কাটে। সর্বত্র কালাজ। হেদো নস্করের ইটের পাঁজা সর্পদংশনে মৃত্যু বাড়িয়ে দিয়েছে।

সাপ কামড়াবে, মানুষ মরবে, এতে মানুষের মধ্যেও এক পরাজিত মানসিকতা। নদীটির নামও যেন সেই পরাজয়ের সহায়ক। নদীর নাম যদি বেহুলা হয়, তবে স্ত্রী-পুরুষে লখিন্দর হবেই। মনসা পুজোর সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। এখানে মনসা বাস্তু রূপে ঘট ও মনসা-সিজের ডালে পূজিতা। পুজোর দিনে নানা নিধি রান্না। পরদিন অরন্ধন। অনেকের কাছে এটি "রান্না পুজো" নামেও পরিচিত। পতিত ইটের জমিনে কালাজ চাষে সোনা ফলাবার পর থেকে হেদো নস্কর মনসাপুজোর ধূম বাড়িয়েছে। এখন ও এ কথাও বলে, 'তো বেটাদের ছেদ্দা নি। তাতেই সাপে কাটে। আমার ইটের পাঁজা হতে সাপে বিরিদ্দি, তবে আমায় কেন কাটে নে?'

কথাটি ও বসন্তকেও বলে। বসন্ত অন্য মানসিকতা এবং অন্য পৃথিবীর মানুষ। গবেষণা করতে এসেছে, হেদো নস্করের সর্বশক্তি-মানতা ওর কাছে অনস্তিত্ব। এস. ডি. ও. ওর ভগ্নীপতি। তাঁর মাধ্যমে এই থাকার ব্যবস্থা। হাকিমকে অবলাইজ করতে পেরে হেদো নস্করও খুব খুশি। রেজিম যে রকমই হোক, হাকিম-হুকুম থাকলে কিঞ্চিৎ ফায়দা ও ওঠাবেই।

হেদোর কথা শুনে ও গ্রামীণ মানুষের সংস্কারবদ্ধতা দেখে শুধু, এবং ঈষৎ হেসে বললে, 'কার্বলিক ঢালছেন, আলো আছে বাড়িতে, ঘাসজঙ্গল রাখেন নি, জুতো ছাড়া বেরোন না, সাপ কাটে না।'

'না মশায়। ইটের-পাঁজা ইটের-পাঁজা, সবাই বলতেছে। পাঁজা ঝকন ছিল না, তকন সাপে কাটে নে? আমি ত' জ্ঞান হতে দেকতেছি বেউলোয় ভেলা ভাসে। ছিরিপদরও হাতযশ নি। নইলে, ওঝা তুমি, গুণীন মানুষ, ইঞ্জিশান দেবার কতা বল কেন?'

'বলে বুঝি?'

'আরে বাপু রে! আমারে ছিঁড়ে খায়। ইঞ্জিশান আনার বেবস্তা কর। ঝেই বলচ ইঞ্জিশান, সেই তুমি হার মানচ তো?'

'হেল্‌থ-সেন্টার স্নেক ভেনম অ্যান্টিসিরাম রাখে না? বলেন কি?'

'রাখে কখনো? এ দক্ষিণে কোতা সাপের কোপ নেই? সর্বত্তর সাপ মশায়। শতে-শতে মানুষ মারে। নরে-নাগে বাস, কতায় বলেচে। হেল্‌থ সেণ্টারও হয়েচে। সেতা ইঞ্জিশান কোতা আচে? যে সনে অনেক মরে, সে সনে এট্টু পাটায়। পাটাবে বা কেন? সাপে কাটা হল নিয়তি। কে কবে সাপের লেখা হাতে বাঁচে?'

বসন্তর মনে এ্যাকাডেমিক আকর্ষণ জাগে। সাপ সম্পর্কে এই পরাজিত মনোভাব কেন? তারপর ওর মনে হয়, সর্পদংশনে মৃত্যু যেখানে ক্রনিক, সে অঞ্চলে স্নেক ভেনম অ্যান্টিসিরাম থাকে না কেন? সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরও কি মনে করে, "সাপের কাটা কপালের লেখা?"

'সাপে কাটলে?'

'ছিরিপদ।'

'সারাতে পারে?'

'পারলে ও, না পারলে ও। তবে ও মলে পরে খুব চিন্তা। ছেলে ও পতে যায় নি।'

'ওর বাবাও এই কাজ করত?'

'সে ছিল গুণী মানুষ। রামপদ মালের নাম এ দিগরে ঝানত্‌ সবে। কাল মরেচে, আজ ভাসাতে নেস্‌চে, রামপদ বলে, দারোগা বাবু? ছেলে যে বেঁচে আচে গো! জীয়ন্তে ভাসাবে?—দারোগা বলে, জেবন দে, তোরে পাঁচশো টাকা দেব। সে ছেলেরে রামপদ বাঁচাল, টাকা নিল, আমার স্বচক্ষে দেখা। তখন আমি ছোট।'

'শ্রীপদকে দেখতে হচ্ছে।'

'ও গুনো কি? শিশিতে?'

'ইঞ্জেকশান।'

'ইঞ্জিশান?'

'সাপ নিয়ে কাজ করি তো!'

'কাজ হয়।'

'আমাকে তো দু বার কামড়েছে। বেঁচে তো আছি। তাহলে কাজ হয় নিশ্চয়।'

'সাদা গুঁড়ো ঝ্যামন?'

'পাউডার - সিরাম।'

'কাজ হয়? অ্যাঁ? ওই সাদা গুঁড়ো ইঞ্জিশান করলি মানুষ বাঁচবে?'

'আমি বেঁচে আছি, না?'

এখন হেদো নস্কর অন্য কথা পাড়ে। বলে, 'হাকিমের সম্মন্দি, এ ছোটলোকের কাজে এলেন বা কেন? এ কি ভদ্দরলোকের কাজ?'

বসন্ত সে কথার জবাব দেয় না ও বলে, 'কলটা কোথায় আপনার?'

'ওই ঝে? চাপা কল, সেপটিক সেজখানা, মান্যিগন্যি মানুষ এলে এই হেদো নস্করের ঘর। তা, স্টোভ, বাসন দেখচি?'

'রাঁধব না? খাব কি?'

'আমার বাড়ি থেকে রেঁধে খাবেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনুন, এই যে ঘরের ভাড়া দিচ্ছি, আবার খাওয়ার জন্যে খরচ করব, সবই তো আমি পাচ্ছি। তাহলে আপনার নিতে কি?'

'ঝাক, দুদটা ঝ্যানো কিনবেন না।'

'টিনের গুঁড়ো দুধই তো আছে।'

হেদো হেসে ফেলে ও বলে, 'বুঝিচি। ভগ্নীপোতের নিষেদ। ঝাক, দরকার-অদরকারে বলবেন।'

দু-এক দিনের মধ্যেই শ্রীপদ ও বসন্তের সাক্ষাৎ ও বন্ধুত্ব হয়। যুদ্ধের মাধ্যমে। চরণ বেরার যুবতী ও সধবা, গর্ভবতী মেয়েকে যেদিন সাপে কাটে।

বসন্ত চা খেয়ে কাপ-ডিশ ধুচ্ছিল। হঠাৎ লম্বা মত একটি লোক ছুটতে ছুটতে আসে। বলে, 'আপনি ইঞ্জিশান নে চল বাবু, ছিরিপদ ডাকতেছে।'

'কেন ?'

'মালতীকে সাপে কেটেছে গো, গভবতী মেয়ে !'

বসন্ত ইঞ্জেকশান নিতে নিতে বলে, 'বাঁধা হয়েছে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। ছিরিপদ……'

চরণ বেরার বাড়িতে উঠোনে মেয়েটি শায়িত। বসন্ত দেখে একেবারে নিয়ম মতে উরুব ওপর তিনটি বাঁধন। বাঁধনের নিচে নিয়ম মতে চেরা ও কাটা। রোগা, হাড়পাকানো, ঝাঁকড়াচুলো শ্রীপদ ক্ষিপ্রহাতে বাঁধন খোলে, একটু ওপরে বাঁধে। বাঁধতে বাঁধতে বলে, 'বাবু এয়েচেন ? ইঞ্জিশান ছ্যান, ইঞ্জিশান ছ্যান, তেমন জুতে কামড়াতে পারে নি, তবু শিয়ড়চাঁদা বলে কতা !'

বসন্ত ইঞ্জেকশন দেয়। হাঁড়ি দেখে বলে, 'গরম জলের তাপ দিচ্ছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

ক্ষত স্থানের পাশে, গোড়ালিতে শ্রীপদ নরুণ চেরে ও মেয়েটি অস্ফুটে "আঃ" বলে। শ্রীপদ বলে, 'রা কেড়েচে ঝকন, তকন আশা আচে।'

'তাই বল ছিরিপদ ! জামাই থুয়ে আবাদে গেল। এ কি হল মা ?'

শ্রীপদ খুব খাবাপ কথা বলে ও খ্যাঁচায়। বলে, 'মাটিতে হাঁড়িকলসি জাঁদ করেচ, মনে থাকে নে ? কোতা বাস কত্তেচ ? কলসির পোঁদ জইড়ে, বুঝলেন বাবু ? ঝ্যামন ক্কাচে গেচে !'

'সাপটা ?'

'তিনি বামুন তো ! এখন কালনিদ্দা যাচ্চেন। পরে দাহ হবেন।'

ঘণ্টাখানেক বাদে মেয়েটির বিপদ কাটে। চরণ ও তার স্ত্রী শ্রীপদর পায়ে পড়ে। শ্রীপদ ওদের প্রণাম নেয় ও ফিচেল হেসে বলে, 'বাঁচাল উনি।'

বসন্তও প্রণাম পায় কয়েকটি। শ্রীপদ বলে, 'আবাদ হতে জামাই

এলে একদিন মনসামঙ্গল লাগিয়ে দাও হে চরণ। অনেক কাল থ্যাট জোটে নে। গরানের নৌকো বেয়ে-বেয়ে চাট্টি টাকাও তো করেচ।'

'সে আর বলতে?'

শ্রীপদ বলে, 'চলুন বাবু, ঝেয়ে দুটো কতা বলি। হেতা বিপদ সেরে গেচে।'

চরণের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শ্রীপদ বলে, 'আসুন, সাপের চাষ কোতা হচ্চে দেকুন।'

দূর থেকে ওরা পতিত ইটের পাঁজাটি দেখে। শ্রীপদ বিড়ি ধরায়, মাটিতে থুথু ফেলে বলে, 'ওই গুখেগোর ব্যাটা হেদো নস্কর।'

'ওঁরই পাঁজা?'

'নয়তো এমন কীত্তি কার? সাপের মহল্লা এটা। সাপে-কাটা লাশ টানতে টানতে বেউলোর জল মজে যাচ্চে। বর্ষা ছাড়া সোঁত নি, তাতে নস্কর সাপের চাষ দিল।'

'আচ্ছা, সাপে-কাটা লাশ পোড়ায় না কেন?'

শ্রীপদ বিষণ্ণ হাসে। বলে, 'বলে দেন গে, মাত্তে আসবে। নদীর বওতা থাকে, লাশ টেনে তামলীতে ফেলল, লাশ ঝেয়ে সাগরে সামিল হলেন! বেউলো তো মত্তে বসেচে। ই কি আবাদ? ঝে ঝত খাল-নদী সব ঝেয়ে সাগরে পড়তেচে ঝপাঝপ। পুইড়ে দে লাশের কাপড়টা ভাইসে দে, বলার জো আছে?'

কথাগুলির পেছনে একটি পরিচ্ছন্ন ও যুক্তিনিষ্ঠ মন উঁকি মারে ও বসন্তকে চমকে দেয়।

'ইটের পাঁজা ভেঙে ফেললে হয় না?'

শ্রীপদ ওকে বলে, 'চলেন, আমার ঘরে চলেন। বসে কতা কই।'

'বসন্ত সাপ-বিষয়ক গবেষণা করছে বটে, কিন্তু সাপুড়ে বা সাপের ওঝা বিষয়ে ওর ধারণা শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত: প্রথম পর্ব" বইয়ের ভিত্তিতে গঠিত। শ্রীপদ কোনো অংশেই "শাহজী" সদৃশ নয় দেখে ও মনে-মনে ধাক্কা খায় যেন। শ্রীপদর বউ ওদের চা করে দেয়, এবং

তার চেহারা মোটেও অন্নদা দিদির কাছ দিয়ে যায় না দেখে ও আবার ধাক্কা খায়। তারপর বোঝে, উক্ত কাহিনীর চিত্ররূপ ওর ধারণাকে গঠন করেছিল। নইলে পশ্চিমবঙ্গের সাপুড়ে ও মিসেস সাপুড়ের পক্ষে, মঞ্চ-পর্দার কুশলী নট-নটী সদৃশ হওয়া খুবই কঠিন। বহু দুধ-মাখন-মাছ-মাংস-আল্লাদী জীবন হলে তবে মঞ্চ বা পর্দায় দুর্গত নিরন্নের চরিত্রায়ণ সম্ভব।

শ্রীপদ বলে, 'কোতা হতে হেতা এলেন? ইর্‌ফানপুরের ডাক্তার বলিছিল বটে আপনি আসবেন। তা এমন ভাগাড়ে কেন?'

'সাপে-কাটায় মরে বেশি, সাপে-কাটা নিয়ে আমার কাজ, তাই এসেছি।'

'ডাক্তার? ইঞ্জিশান দেবেন?'

'ডাক্তার নই। তবে ইঞ্জেকশান, যদ্দিন থাকব, তদ্দিন দিতে পারব।'

'কদ্দিন থাকবেন?'

'তিন মাস।'

'অ। তা ইট-পাঁজার কতা কি বলছিলেন?'

'ওটা ভেঙে লোপাট করে দিলেই তো হয়।'

'সে বলতে গেলে বিত্তান্ত! হেদো নস্কর ঝকন ইট পাঁজা খরচা পোষাবে নে বলে ঠিক করল, তকন এক কণ্টাকটর এইছিল। ইট নে আবাদে ঝাবে। বেউলো হয়ে তামলী হয়ে নৌকোয় নে ঝাবে।'

'তারপর?'

'পিচেশ তো? আমি বল্লু, বেচে দাও বাবু, হোতা সাপের শওর হবে। বলল, দরে না পোষালেও বেচতে হবে? রইল পাঁজা। কেরমে সাপের শওর হল। ওনার দরে ঝকন পুষল, তকন ওর কাচে ঝাবে কে? সাপের সঙ্গে খেলা চলে? গত সনে বল্লু, বৈশেকে মাটি শুগনো, পাঁজা বেড়ে খাল কেটে আগুন দাও। ক টিন কেরাচিনি পাঁজায় ঢালতি হবে, খানাতেও কাঠ-ঝোপ পোয়াল ফেলে

কেরাচিনি দিত্তি হবে। এতে সাপ মরে, আমি সেই মেদ্নীপুরে দেকে এইচি। এক পতিত গড় সাপের পাঁজা হইছিল। এমনি ভাবে আগুন দে সাপ পুইড়ে গরমেন্ নিকেশ করল। সে গড়ের ঠেঙে একন ইশকুল।'

'রাজী হল না?'

'না। বলে ইটের পাঁজা কি আমার ঘরের দোরে? বিশ টিন কেরাচিনির ফন্দ হাঁকচ, পয়সা তুমি দেবে? উনি কেরাচিনির কণ্টোলের মালিক। কেরাচিনি ওকে পয়সা দে কিনতে হতুনি। তবুও ছাড়ল না কেরাচিনি।'

'আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। অমন বাঁধন দিতে, বাঁধন সরাতে, চিরতে আপনি শিখলেন কি বাবার কাছে?'

'নিচ্চয়। বাবু! আমি ইস্তিশানের কতা বলি বলে সবাই ঝেনে গেচে ছিরিপদ আসলে ভুষো মাল, কিচ্চু ঝানে নে। কিন্তুক…'

'কি?'

'আপনি তো সকল ঝানো।'

'বলুন না।'

শ্রীপদ উশখুশ করে ও বলে, 'সে কতা পরে হবে। একন ঝান। চ্যান-খাওয়া সারুন। আপনিও রইলেন, আমিও রইলাম।'

বসন্ত চলে আসে। ও ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে হেদো নস্করের ঝি থালায় সার-সার বাটি বসিয়ে ঢাকা দিয়ে নিয়ে আসে। বলে, 'গিন্নি মা বলল, ভদ্দরনোকের ছেলে ঝ্যামন চাল ফুট্রে নেয়। তরকারির হাংনামা কত্তে হবে নে।'

বসন্ত ঢাকা খুলে বড় বড় মাছের দাগা দেখে ভির্মি খায় ও বলে, 'তোমার গিন্নিমাকে বলবে, আজ পাঠিয়েছেন, নিলাম। আর যেন না পাঠান। আমি এত খাই না।'

হেদো নস্করের ইটের পাঁজার কাহিনী শোনার পর থেকে ওর মনে একটা "কিন্তু" এসে গেছে। এমনিতে ও খুব শান্ত স্বভাবের ছেলে।

কোন ঘটনা নিয়ে ক্ষুব্ধ হলেও ও কিছু বলে উঠতে পারে না। তার ওপর, মধ্যবিত্ত স্বভাবের দরুন, পরের ঝ্যাপায় জড়াতে ও একেবারে নারাজ। তবু, সাপ নিয়েই ওর কাজ, এবং সর্পদংশনে মৃত্যুর ভয়াবহতা ও জানে। একটা লোকের ইটের পাঁজার জন্যে গ্রামে এত লোক মরবে? বছরে বিশ-পঁচিশ জন?

কথাটি ও ওর ভগ্নীপতিকেও বলে, নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে। এস. ডি. ও. কথাটিতে গুরুত্ব দেন না ও বলেন, 'হ্যাঁঃ! এর আগে মানুষ সাপের কামড়ে মরত না? ইটের পাঁজার কারণেই মরছে?'

'ডেথ রেট বেড়ে গেছে।'

'সে যা হোক, ও নিয়ে তুমি ঘাঁটাতে যেও না। লোকটা সুবিধের নয়।'

'আসল কথা হল, এখানে হেল্‌থ সেণ্টারে অ্যাণ্টিসিরাম দরকার।'

'দরকার তো জানি। ডাক্তার আছে, রিকুইজিশান দেবে, দেখা যাক।'

ভগ্নীপতি বসন্তকে তাঁর নিজস্ব সমস্যার কথা বলেন। এখন বেহুলা ব্লকের অবস্থা বেশ শান্ত। বর্গাদার সমস্যার একরকম সমাধান হয়েছে। সবাই খুশি নয়। কিন্তু কবে কী হয়েছে, যাতে সবাই খুশি হয়েছে? পঞ্চায়েতি নির্বাচনও একরকম উৎরে গেছে। হেদো নস্কর পঞ্চায়েত-প্রধান। কোনো কারণেই তার ও গ্রামবাসীর সম্পর্ক তিক্ত করা ঠিক নয়। জোতদার পঞ্চায়েত-প্রধান হলে গ্রামবাসীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল থাকে না, থাকার কথাও নয়। কিন্তু "আমার বক্তব্য হচ্ছে, সম্পর্ক মন্দ হলে আপনা থেকে হোক। তোমাকে নিয়ে যেন কোন সিচুয়েশন না বিস্ফোরক হয়। গ্রামে শিক্ষিত, বাইরের ছেলে থাকলেই পোলিটিকাল চেহারা নেয় সকল ঘটনা।"

বসন্ত জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে গ্রামে ফেরে এবং শ্রীপদ মাল তাকে ডেকে যায়। চরণ বেরার বাড়িতে মনসামঙ্গল হবে। 'খুব গান-নাচ হবে।

মনসার ভোগ দেবে চরণ। আপনি তো ফিরতি টিকিট কেটে হেথা এয়েচ, চল দেকে আসবে।' বসন্ত সম্মতি জানায়।

হেদো নস্কর খুঁতখুঁত করে। বলে, 'হাকিমের শালা হয়ে হোতো ঝাবেন? শালারা মাকে খিচুড়ি ভোগ দেয়, তাই খাবেন?'

'সাপ নিয়ে কাজ! না বলতে পারি?'

হেদো নস্কর ব্যাপারটি সুচক্ষে দেখে না ও বউকে বলে, 'নানা নিদি পাটাতে হবে নে রেঁদে রেঁদে। ভদ্দরলোক! এক কাজ বলে এয়েচে, কে ঝানে কি মতলব? নয় তো বন্ধু হল ছিরে মাল!'

'তোমার সাতে পারবে?'

'তা কখনো পারে? তবে ঝেয়ে হাকিমের শালা! তেমন ঘাটাতেও চাই না। ভাল-ভালন্তে দু-তিন মাস কাট্যে চলে গেলেই শান্তি। হাকিম বলল, নস্কর, হোতাকে রাখ। নইলে আমি ছেঁড়া ঝামেলা জোটাই?'

'জেলে ঘরে আসতেচে মাচ বেচতে, বাগদী ঢুকে শাক বেচছে, সব ছোঁয়ান্থাপা হচ্চে।'

'ও কতা বোল নি। একন ও সব কথা মনে হলে কিল খাবে, কিল হজম করবে।'

বসন্ত কিছুই জানতে পারে না এবং মহানন্দে মনসার গান শুনতে যায়। চরণের উঠোন লেপা-পোঁছা। হ্যাজাকের আলোয় মনসার ধ্বজা হাতে শ্রীপদ এসে দাঁড়ায়। এক পায়ে ঘুঙুর, এক হাতে ঘুঙুর-দেওয়া বালা পরে সে তাল দিয়ে দিয়ে গান গায়। দোহার ধরে ওর সঙ্গী ও ছেলে। মনসার গান বলতে বেহুলার উপাখ্যান। বসন্ত গান শুনে বোঝে, এরা কাহিনীটিকে আঞ্চলিক রূপ দিয়েছে।

শ্রীপদর গানে, বেহুলা ও লখিন্দর সংসার করতে থাকে। শেষে লখিন্দর স্বর্গে যায়। বেহুলার ওপর অভিশাপ নামে। দেবতারা বলেন, দেবসভায় লাস্য দেখিয়ে নেচেছিল বেহুলা। তার ফলে যে পাপ হয়, সে পাপ খণ্ডাতে বেহুলাকে, কলিকালে বেহুলা নদী হয়ে

বয়ে যেতে হবে। সর্পদষ্ট শব ওর জলে ভাসলে সদগতি পাবে। বেহুলা বলে, কবে সদ্‌গতি হবে আমার? দেবতারা তার উত্তর দেন না। সেই থেকে বেহুলা নদী হয়ে বইছে। গানের শেষে মনসা বন্দনা হয় ও উঠোনে ধ্বজা পোঁতা হয়।

খুবই মূল্যবান অভিজ্ঞতা। খাঁড়ি মুসুরের খিচুড়ি পাঁচ রকম ভাজা মায়ের ভোগ। খেতে খেতে শ্রীপদ গভীর বিশ্বাসে বলে, 'এখানেই হইছিল সব। চম্পাই নগর এখন বেউলোর গব্ভে। বেউলো যেখানে দাঁইড়ে দাঁইড়ে নদী হয়, সেখানে এক আশ্চাজ্জ কদম গাচ আচে। বৈশেখে কদম ফুল ফোটে।'

চরণ বলে, 'বোশেখ অব্দি রইলে দেকবেন, বেউলোর মেলা বসে। সেতা নানা ঠাঁই হতে মাল আসবে, সাপের খেলা দেকাবে, দেকার জিনিস।'

শ্রীপদ বলে, 'সাপ ধত্তে আসে।'

'সাপ ধরে?'

'ধরে না? সাপ এখন ভাল ব্যবসা। খপাখপ দাঁড়াস ধরে। চামড়ার দাম কলকাতায় বিস্তর। জীয়ন্ত গোকরো ধল্লে কবরেজী দোকানে ওষুধ কত্তে বিষ নেয়।'

'আপনি সে কাজ করেন না?'

'নাঃ! বাবার নিষেদ। কত্তে নি।'

'চলে কি করে?'

'চলে নে। চ্যায়রা দেকে বুজচেন না? নস্করের জমি ভস্‌সা। যারে বলে নির্ভস্‌সা।'

'কত জমি?'

'সরকারী সিলিংকে কলা দেকিয়ে বিস্তর জমি। কোনটা দেবত্তর, কোনটা কারখানা করবে বলে রেকেচে, কোনটা দেকাচ্চে ফলবাগান হবে, কোনটা না কি মেছো ভেড়ি হবে—সর্বত্তর চাষ হচ্চে। ধান-কলাই-পাট—সে বিস্তর চাষ।'

'উনি চেষ্টা করলেই ত ইঞ্জেকশন আসে।'

'করবে কেন? কোনদিন কিচু করল নে, আবার ওই হল পঞ্চায়াতের মাতা, আমারা চিরকাল ওর কাচে বাঁদা রইলাম।'

খাওয়া শেষ হয়। শ্রীপদ বলে, 'চলুন, আপনাকে পঁউচে দিই। রাত হচ্চে, তেনারাও বেরুচ্চেন। দাঁড়ান, লাঠি নিই। ওই লাঠি ঠক-ঠক ভস্‌সা। টচবাতি কিনব, তা আর হয়ে উঠচে না।'

'না, আমি চলে যাব। কিন্তু আপনার সঙ্গে বসতে হবে। আমার কাজে আপনি সাহায্য না করলে পারব না।'

'সে বসব। এট্টা কতা। এই ইঞ্জিশানে মানুষ বাঁচে তো?'

'সময়ে পড়া চাই। তবে ভাল মত বিষ ঢুকলে কাজ হয় না।'

'এ ইঞ্জিশান ওষুদ কোম্পানি তৈরি করে না কেন? নানা নিধি কত্তেছে?'

'যাতে বছরে মাত্র বিশ হাজার লোক মরে, তার ওষুধ তৈরী করলে পড়তায় পোষায় না। কামড়ায় লাখ চারেক লোককে, মারা পড়ে হাজার বিশেক। তার মধ্যে'ও নির্বিষ সাপ কামড়ালে ভয়ে মরে কিছু, বাজে ওঝার হাতে মারা পড়ে কিছু। আপনি এ কথায় রাগ করবেন না।'

'না, রাগ করব না। আমি নিঝের ক্ষ্যাম্‌তার দৌড় ঝানিনি? কাল কতা হবে। একন চলে ঝান।'

পরদিন শ্রীপদর বাড়ি যায় বসন্ত। নিজের কাজের কথা বলে। শ্রীপদ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিবাদী কথা বলে ওকে অবাক করে দেয়। শ্রীপদ বলে, 'যতাস্তানে এয়েচেন। উপোসী ক্যাংলার শরীলে কালাজ্বের, আমরা শিয়ড়চাঁদা বলি, তার বিষে কি হয়! সে ত আমি মুখেই বলে দিতে পারি। একেনে সকলঝনা উপোসী ক্যাংলা।'

'মনে হচ্ছে স্বচক্ষে দেখতে পাব।'

'তা পাবেন। হেদো নস্করের পাঁজা। আপনার ভগ্নীপোত কি বললেন? চমকাচ্চেন কেন? হেতা কোন কতা চাপা রয় নে।

হাকিমের সম্মন্দী বলে হেদো চুপ আচে। নইলে আপনি ছোট-লোকদের সঙ্গে মিশতেচ, তাতে কি ও চুপ রইত? টাকা আচে ত! ওর জ্যাটাতো ভাই পরাণ নস্কর হেলে চাষা, তাতে সেও হেদোর কাচে ছোটলোক। জব্দ হইছিল সত্তর সনে। হেতা পটকাটিও ফোটে নে, ও বেটা ভয়ে পালাল, বলে গেল, ধান কেটে তোরা নি গে যা ভাগ করে।'

'কালাজ কাটলে কি কি লক্ষণে বোঝেন?'

'বাবু! উনি হল যম! গোখরো কাটলি, উনি কাটলি শিরায় ঝিমুনি লাগে, ঝিঁঝিঁ ধরে ঝ্যামন, তবে গোখরো কাটলি জ্বালা, চন্দর-বোড়া কাটলি পুড়ে ঝায়, ইনি কাটলি তকনি যন্তরনা নি। বিষদাঁত এত্টুনি। তা বাদে হাড়ের মদ্দে শিরশিরনি, কাটার ঠেঙে যন্তরনা, আর সকল শরীলে এলে ঝিমঝিমে ঘুম, চোকে ঝাপসা দেকে।'

'আপনি তো সব জানেন।'

'বইয়ে নেকা আচে?'

'ঠিক এই কথা লেখা আছে।'

'রাগ করনি। আপনার শিক্কা বইয়ে পড়ে, ওই ঝারে বল লাইবেরি—'

'লেবরেটরি।'

'ওই হল। সেতা সাপ দেকে শিক্কা। আমরা নরে-নাগে বাস করি। তায় সাপের ওঝা! মাল!'

'এই যে চিকিৎসা করেন, এ আপনার বংশগত কাজ। আবার ইঞ্জেকশনেও বিশ্বাস। সাধারণত সাপুড়ে বা মালরা ডাক্তারী ইঞ্জেকশনের ওপর চটা।'

'দেখুন, একন ভেঙে বলি। অন্যদের কতা বলব না। আমি ওদের গোত্তরের মাল নই। দাঁড়ান, দেকাই। অ রাধি! সাট্টি-ফিকেটটা আন্ তো মা?'

শ্রীপদর ভাইঝি একটি বিবর্ণ ও কালি ফিকে হয়ে যাওয়া বাঁধানো

কাগজ আনে। তাতে লেখা আছে, তামলী প্রাইমারি স্কুল থেকে শ্রীপতি মাল বৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ওটি নিস্পৃহ কণ্ঠে নিয়ে যেতে বলে শ্রীপদ। বিড়ি টানে। চোখে কোন অতীত। বেদনা। তারপর বলে, 'তকন কোতা ইস্কুল নি। মাসে তুটো টাকা হলে ইরফানপুর ইস্কুলি পড়া হতু। হেদোর বাপের ঠেঙে আমার বাপ কত ব্যাগ্যতা করিছিল।'

'দিল না?'

'না। বলল, আজ মালের পো পড়বে, কাল জেলের পো পড়বে, পরশু তোরা মাতায় পা রেকে চলবি। তাতেই হয় নে।'

'সেই থেকে এই কাজ করছেন?'

'এ কাজে তো পয়সা নি। ঝকন চাষ হয়, হেদোর খেত চষি, পেট না চললি আবাদ ঝাই। সে ঝাক। ওই এট্টু বিদ্যে আচে। বাপের সঙ্গে কলকাতা যেতু, হাসপাতাল দেকিচি। হাসপাতাল ভাল বাবু, ডাক্তারী ভাল, আগে হলি টাইফায়েটে, কলেরায় মরতু সবাই। একন ঝদি সময় থাকতে ডায়মন্‌হারবারে হাসপাতালে নিতে পারি, বেঁচে ওটে। সেতা নিলে বা ইরফানপুরে নিলে বিয়োতে ঝেয়ে মাগীগুনো মরে নে।'

'তাতেই বিশ্বাস এল?'

'না। আরো কতা আচে। জাত মাল ঝদি সাচাই হয়, তাইলে আমার পতে চলবে।'

'যেমন?'

'মানুষ ভয়ে মরে অনেক। আগে কাটা দেকব। দেকে ঝদি ঝানি নিবিষ সাপ, তকন রুগীরে ভস্‌সা দেব, লাফ-ঝাঁপ মারব, মন্তর বলব, কাটা জায়গা ঝাড়ব, ওষুধ দেব, রুগী বাঁচলি আমার হাতযশ হবে। মানুষ ভয়ে মরে বাবু! ঢোড়া-দাঁড়াস-ঘরমুনো-চিতি-লাউডগা নিবিষ। সবাই ঝানে। কিন্তু কামড়ালি ভাবে গোখরো বা শিয়র-চাঁদা কাটল।'

'বিষাক্ত সাপ কামড়ালে ?'

'সকল সময়ে জুত করে কাটতে পারে না। আগে কাটা দেকব। ঝানব কে দংশালেন। ঝকন বুঝব তেজুতে কাটে নি, তকন বাঁধন দেব, চেষ্টা করব। ওষুদ দেব। মন্তর কইব, ঝাড়ব।'

'ওষুধে কাজ হয় ?'

'হয় বাবু। শরীলে তেজুতে বিষ না গেলি কাজ হয়। চালতে-কট্‌কল-টাবা, লেবু-সাদা আর নীল অপ্‌রাজিতা-চিনি-কাঁটানটে পাক করে ওষুদ দেব। আগে বাঁদব, চিরব, মুকে কাপড় নে, বা ধুলো নে কাটা জায়গা চুষব। আরো নানা নিদি ওষুদ আচে।'

'বাঁচে ?'

'বাঁচে কি বলচ বাবু ? এতেই ত বেঁচে আচে। তোমরা বলবে হাতুড়ে টোটকা। তা দেক, কলকেতা থে এত্‌টুনি দূর! না আচে ইঞ্জিশান, না আচে ডাক্তার, এই তো ভস্‌সা।'

'যদি বেজায়গায় কাটে ?'

'বাবু! অন্ধকারে চলে, পায়ে কামড়টা বেশি। ঘরে এসে কাটে, ঘুমের ঘোরে হাতটা পড়ল, হাতে কাটল। তকন বাঁদন চলে। গলায় বুকে-কোমরে কাটে কম। কাটলি মরে! কোতা বাঁদন দেবে ? সর্বত্তর কি বাঁদন চলে ?'

'ভাল মতো কাটলে ?'

'বাঁদন দেব, চিরব, চুষব, ইরফানপুর নিতে বলব। সেতা ঝেয়ে, গত সাত বছরে মাত্তর দু বার ইঞ্জিশান পেইচি, বেঁচেচে। ভাল জুতে কাটলে মালের সাধ্য নি বাবু। ঝারা ভুষো মাল, তারা তেমন রুগী নে বাঁদন খুলবে, মন্তর দেকাবে, কিন্তুক তুমি ত ঝানো, তেমন বিষ দেহে গেলি ইঞ্জিশানেও কাজ হয় নে। কলকেতায় ডাক্তার বলিছিল। তাতেই বাবা বাঁচেনি।'

'সাপ কামড়েছিল ?'

'শিয়ড়চাঁদা।'

এ কথা বসন্তও জানে। বারো মিলিগ্রামের বেশি গোখরোর বিষ, পনেরো মিলিগ্রামের বেশি চন্দ্রবোড়ার বিষ, ছয় মিলিগ্রামের বেশি কালাজের বিষ শরীরে ছড়িয়ে পড়লে স্নেক ভেনম অ্যান্টিসিরাম বিফল হবে। চন্দ্রবোড়ার ক্ষেত্রে শরীরের রক্তে লালকণিকা ভেঙে যায়, নাক-মুখ-মূত্র ও গুহ্য দ্বারে রক্তস্রাব হয়। তাৎক্ষণিক মৃত্যু। করুণাময়। নয় মাংস গলে-খসে অসহ মৃত্যু। গোখরো ও কালাজের বিষ নিউরোটক্সিন। স্নায়ু অবশ-অবশ, পেশী সংকোচন, লালা নিষ্ক্রমণ, ঘুম-ঘুম ভাব, শ্বাস কমে আসা, মৃত্যু।

শ্রীপদ বলল, 'আমি ঝানি আমার ক্ষ্যামতার দৌড়। আর ইঞ্জি-শান হুয়েচে যকন, তকন মরতি ঝাবে কেন মানুষ?'

'দুর্বল শরীরেও একই প্রতিক্রিয়া হয়?'

'একই। উপোসী ক্যাঙালীর মনে জোর থাকে নে, সামান্য বিষ দেহে গেলিও মরে।'

বসন্ত অত্যন্ত চিন্তাকুল চিত্তে ঘরে ফেরে। সামান্য বিষ দেহে গেলেও মানুষ মরে? দুর্বল ও প্রতিরোধহীন শরীর বলে?

সহসা তার মনে হয়, সব কিছু এ্যকাডেমিক আগ্রহে দেখা ঠিক নয়। দুর্বল শরীরে, কালাজ বিষের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়, তা ও দেখতে ও লিপিবদ্ধ করতে পারে। কিন্তু মহানগরীর এত কাছে একটি গ্রামে এত অন্ধকার কেন?

লাভে পোষাবে না বলে নস্কর ইট বেচবে না। পরিণামে কালাজের বংশবৃদ্ধি ও মানুষের মৃত্যু। মানুষগুলি অনাহারে শীর্ণ কেন? নস্কর এই ক্রনিক অনাহারে কোন ভূমিকায় আছে? কেন হেল্‌থ-সেন্টারে অ্যান্টিসিরাম থাকে না?

হেল্‌থ-সেন্টারের ছোকরা ডাক্তার মাথা নাড়েন। না, তিনি জানেন না কোন "কেন"র উত্তর। কলকাতায় স্বাস্থ্যদপ্তর মানে মন্ত্রী-আমলা-ফাইল। মানুষ ও মানবিক সমস্যা সেখানে ফাইলে লিখিত অক্ষর মাত্র।

বলেন, 'আমার হাসপাতাল দেখলে বুঝবেন। একটা বেডে ছয়জন পোয়াতি বাচ্চা নিয়ে থাকে, এমনও হয়। এ্যান্টিসিরাম? চাইলাম এ্যান্টিসিরাম, পাঠাবে এণ্টারোকুইনল। অফিসিয়ালি নো ম্যালেরিয়া। তাই ম্যালেরিয়া হচ্ছে জানালেও ওষুধ পাঠাবে না। পাঠায় গাদা গাদা কণ্ট্রাসেপ্‌টিভ ট্যাবলেট আর একটা মিক্‌স্‌চার।'

'বলেন কি?'

'ডেটল নেই, তুলো নেই, সিরিঞ্জ নেই, ক্লিনিকাল টেস্‌টের কোন ব্যবস্থা নেই, মার্কুরিক্রোম অব্দি দেবে না মশাই। কোয়ার্টার নেই, মেয়ে নার্স পাই না। জমাদারের স্যাংশান নেই। তবু মানুষ বেঁচে ফেরে। কেন জানেন? এরা বোধহয় যমের অরুচি। ফলে সব কেস্‌ পাঠাই কলকাতা নয় ডায়মন্‌ডহারবার? কি করব?'

'অ্যান্টিসিরাম চেয়ে পাঠান।'

'পাঠাই মশায়, পাঠাই।'

'পান না?'

'না। আপনার কাছে আছে শুনলাম?'

'সে ত সামান্য।'

'দেবেন?'

'দেখি। আপনার দরকার ত বেশি।'

'অত্যন্ত মন ভেঙে যায়, জানলেন? জানি ইঞ্জেকশন দিলে সারবে, বেঁচে যাবে, অথচ···শ্রীপদ যখন আনে কেস···আমার কি মনে হয় জানেন?'

'কি?'

'ইনট্রাভেনাস দিতে পারবে না, কিন্তু ট্রেনিং দিতে পারলে শ্রীপদর মত বুদ্ধিমান লোক স্বচ্ছন্দে ইমট্রামাস্‌কুলর বা সাবক্যুটেনস ইঞ্জেকশান দিতে পারত। অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। লিগেচার, সাক্‌শন সব করে তবে আনে। বাঁচায় ও, অথচ ও হল কোয়াক, আমি ডাক্তার।'

'সাকশন করা কি ঠিক?'

'ওর দাঁত আর মাড়ি ভাল।' দেবেন সিরাম ?

'দেখছি।'

'আপনার ভগ্নীপতিকে বলুন না ?'

বসন্ত হেসে ফেলে। বলে, 'খবরটা সবাই জানে, তাই না ? অথচ হিমাদ্রিদা এখানে আসেন নি, আমিও কাউকে বলিনি। তবু সবাই জানে।'

'ছোট জায়গা ত!'

'বলব।'

ভগ্নীপতি বসন্তর ওপর খুশি হন না! বলেন, লিখে দিচ্ছি, কলকাতায় এখানে গেলে পাবে। খানিকটা পাবে। তবে আমার নাম যেন জানাজানি না হয়। হেল্‌থ-ডিরেকটারেট কিছুই করে না। কলকাতার হাসপাতালগুলোই সভ্য দেশের পক্ষে লজ্জার বিষয়। মফঃস্বলে হেল্‌থের ব্যাপার একেবারে আদিম অবস্থায়। হেল্‌থ সেণ্টারে ওষুধ দেবে! হেল্‌থ সেণ্টার! কটা জেলা-সদর হাসপাতালে ও. টি এআর-কন্‌ডিশন্‌ড, এক্‌স-রে মেসিন ফাংশান করে, রুগীর বিছানা পরিষ্কার ? ওয়ার্ডে কুকুর ঘুরছে! এবার লিখে দিচ্ছি, কিন্তু ও নিয়ে তুমি বেশি মাথা ঘামিও না। আমি চাকরি করতে এসেছি, চাকরি করে শান্তিতে থাকতে চাই। বাঘের ঘরে ঘোগ ঢুকে গেছে। তোমার ছু দিনের উৎসাহে কিস্‌সু হবে না।'

বসন্ত কলকাতা চলে যায় ও অ্যান্টিসিরাম নিয়ে ফেরে। যাঁর কাছে যায়, তিনি, "অ! অ্যান্টিসিরাম!" বলে ঝিমিয়ে পড়েন ও দিয়ে দেন। তারপর, বলা উচিত বিবেচনায় বলেন, 'এর আবার সব রিঅ্যাকশন আছে।'

'জানি।'

'কি জানেন ?'

'ও তো আমাদের ইনস্টিটিউটেই তৈরি হয়। আচ্ছা এগুলো কি এখানেই থাকে ?'

'আমি ত তাই দেখছি। দেওয়ালের শোভা আর কি।'

বসন্তর আবারও মনে হয়, যদি বাজারী ওষুধ হত! তারপরই তার বিপক্ষীয় যুক্তিগুলি ওর মনে জাগে এবং হতাশ লাগে ওর। সর্প-দংশন কোন ওষুধ কোম্পানিকে আগ্রহী করতে পারে না। কেন না সাপ কামড়ায় চার লাখ মানুষকে, মরে হাজার বিশেক। খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার হল, বহু বছর ধরে ওই বিশ হাজার মৃত্যুর পরিসংখ্যান থেকে যাচ্ছে প্রায় এক চেহারায়। ভারতে কি সাপ ও মানুষে কোন সমঝোতা আছে?

বেশ, ওষুধ কোম্পানি না করুক, সরকার ত তৈরী করছে ওষুধ। গোখরো-কালাজ-চন্দ্রবোড়া ও অহিরাজের বিষে ঘোড়াকে হাইপার-ইম্যুনাইজ করে ঘোড়ার প্লাজমা থেকে। প্লাজমাকে রাসায়নিক উপায়ে শুকিয়ে। এই শুকনো অবস্থায় অ্যান্টিভেনম বহুকাল থাকে।

তৈরী করে যদি, বণ্টন করে না কেন? কলকাতায় ওষুধ গুদাম-জাত করে লাভ কি? কেন সাপে-কাটার বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা কলকাতায়? কলকাতার চৌকাঠে থেকেও ইরফানপুর হেল্‌থ সেণ্টার ও বেহুলা ব্লক কেন কালাজের দয়ায় বাঁচবে?

হেদো নস্কর ইট বেচে দিল না কেন? হেদো নস্করদের শাস্তি দেবার উপায় প্রশাসনের হাতে নেই কেন?

এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারের একটি কথা ওর মনে পড়ে এবং স্টেরাইল-পাইরোজেন মুক্ত-ফিজিওলজিক্যাল সল্‌ট সল্যুশন কেনার সময়ে ও সিরিঞ্জও কেনে জুটো, একটি টর্চ এবং আন্দাজে সাইজ আঁচ করে ফুটপাত থেকে কৃত্রিম স্যান্ডাকের পাম্প্‌ও।

ইচ্ছে করেই সন্ধ্যার ট্রেনে ফেরে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারকে বাড়িতে গিয়ে ও অ্যান্টিভেনম ও সল্যুশন দেয়। বলে, আমার নাম যেন কোন মতে জানাজানি না হয়। তাহলে আমি-আপনি ফেঁসে যাব।

ডাক্তার অভিভূত হয়ে পড়ে ও বলে, কোন দিন ভুলব না ভাই।

সাপে-কাটা রুগী ইঞ্জেকশন নেই বলে গ্যাঁজলা তুলে মরে, সে চোখে দেখা যে কি কষ্টের!'

বসন্তর মনে পড়ে, হেল্‌থ-সেণ্টারের মলিন, চটা ওঠা, ফাটল ধরা দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার-কাটা সাঁইবাবা-বামাক্ষ্যাপা ও মা সারদামণি-রামকৃষ্ণের ছবি। বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা, প্রশাসনের নির্মম ঔদাসীন্যে বিফল হলে হতভাগ্য ডাক্তার বোধহয় উক্ত মহান পুরুষ ও রমণীদের মুলগাঁওকর অঙ্কিত প্রতিকৃতি থেকে ভরসা খোঁজে। কিন্তু কালাজ কামড়ালে সাঁইবাবার ছাই ও মধুও বিফল।

ও বলে, 'ট্রেনিং নিয়েছিলেন নিশ্চয়?'

'কিসের?'

'অ্যান্টিভেনম দেবার?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'অ্যান্টি-রিঅ্যাকশনের ওষুধপত্তর আপনি যে করে হ'ক, জোগাড় করবেন।'

'করব।'

'চলি তা হলে।'

'ওগুলো আপনি নিচ্ছেন?'

'রাখলাম কিছু।'

'প্রচুর মরে, জানলেন?'

'জানি।'

'অন্ধকার বড্ড যে?'

'টর্চ আছে।'

অন্ধকারে টর্চ জেলে বেহুলার দিকে চলতে চলতে বসন্তর মনে আজ আনন্দ হয়। যে কারণে আনন্দ হয়, তার সঙ্গে ও যে-কাজ করতে এসেছে তার কোন যোগ নেই।

পরদিন ও শ্রীপদকে টর্চটি এবং জুতো জোড়া দেয়। বলে, 'এমনি দিচ্ছি না কাজ করিয়ে নেব।'

'আমারে দিয়ে ?' শ্রীপদ জুতো জোড়াটিতে হাত বোলায়, গন্ধ শোঁকে এবং ভাষাতীত কৃতজ্ঞতা চোখে নিয়ে বারবার বসন্তর দিকে তাকায়।

'হ্যাঁ। এখন মনে করে বলুন, এমন কোন রুগী পেয়েছেন, যাকে কালাজ কেটেছে, তেমন বিষ ঢোকে নি, আপনি সব চেষ্টা করেছেন, রুগী কয়েক দিন বাদে মারা গেছে ?'

'ভুনি দাসী।'

'সে কে ?'

'শ্মশানের ডোম, সাগরের বউ।'

'কেসটা বলে যান।'

'লিখবেন ?'

'হ্যাঁ।'

'চা বলি ?'

'বলুন।'

'রাধি, চা কর্ মা এট্টু।'

'বলুন।'

'ভুনি দাসী ঘুমোচ্ছিল। মাটিতে শোয়া হেতা, চ্যাটাই পেতে, ঝানেন ত সব। তা হাতের কেড়ে আঙুলে কাটল। আমারে ডাকল, তা গেলাম। ঝেরে বাঁদন দিলাম, চিরলাম, রক্ত চুষলাম। রাতভোর সেতা রইলাম। তা বেলা হতে বিপদ সারল। তাতেও বাঁদন খুলি নি। ঠাঁই সইরে দিয়ে থুয়েছিলাম। সাঁজ নাগাদ বেশ কতা কইল, চোকে পষ্ট দেকল, দেকলাম রক্ত পড়লে হাওয়া লেগে জমচে। হাতে দিব্যি সাড়, ছুঁচ ফোটাতে গাল দিলে। আমি চলে এলাম।'

রাধি চা আনল। চা খেল ওরা। দুধহীন গুড়ের চা পরম তৃপ্তিতে চেটেপুটে খেয়ে গেলাসটা নামিয়ে শ্রীপদ বলল, 'পরদিন সাগর ডাকলে। ঝেয়ে দেকি, হ্যাঁ, বাঁদন খুলে দিচলাম, তা ঝেয়ে দেকি, ঝেদিনে সাপে কাটে, সেদিনে পায়ে বাঁশের চোঁচ ফুটে ব্যাতা হইছিল,

সেই পা ফুলে উঠচে, বুকে ফিক ব্যাতা, আর ক্ষ্যানে ক্ষ্যানে বেহোঁশ হয়ে পড়েতেচে। হোঁশ আসতে বলে, শ্বাস নিতে পারচি না, বুকে ব্যাতা গো! তকনি ইরফানপুর নে ঝাওয়া হল। বাঁচল নি।'

'ডাক্তার কি বললেন?'

'বলল, তুমি ত সাপে কাটার চিকিচ্ছে ঠিকই করিছিলে ছিরিপদ, কিন্তুক, ওর শরীলে কিচু ছিল নে, তাতে ওই ঝে বাঁশের চোঁচ, তাতেও বিষক্রিয়া হল।' শ্রীপদ নিষ্ফল ক্রোধে থুথু ফেলল। বলল, 'ডাক্তারের সেতাও ইঞ্জিশান ছিল নে ঝা ঝা দরকার। যুবতী মেয়েছেলে, তিন সন্তানের মা, ধনুষ্টঙ্কারে বেঁকে গেল। আর কি গ্যাঁজলা মুকে। ছেলেদের মানুষ কত্তে সাগর এই সেদিনে বিয়ে বসল। সাতটি মাস বেচারী কেঁদে কেঁদে মরেচে।'

'এই একটা?'

'আরো আচে। স্বচক্ষে দেকিয়ে দেব। আচেন ত একন? দেখতে পাবেন। আচ্ছা, সাপের বিষ নামল, তাতেও বিষক্রিয়া হল?'

'হয়।'

'নিরাবণ কিসি?'

'তখন ডাক্তার বিনা গতি নেই।'

'ওষুদ নি, ইঞ্জিশান নি, ডাক্তার কি করে?'

'রুগী মরে।'

'আমাদের মরণ সর্বত্তর।'

'এবার শুনুন! ইঞ্জেকশনের ছুঁচ, ওষুধ, সব এনেছি। আপনাকে শেখাব।'

'আমাকে!'

'আপনাকে।'

'আপনি বলচ, আমি পারব?'

'পারবেন। এবার কোন কেস হলে আমি কিভাবে কি করি দেখে নেবেন।'

'ছেলেরে পড়াচ্চি, সে দেকলে হতু না ?'

'সেও দেখুক। আপনি ত চিরকাল থাকবেন না।'

'আমি পারব ?'

'পারবেন। আমি জানি, তাই শিরায় ইঞ্জেকশন দিই। আপনি দেবেন হাতের বা পায়ের এমন জায়গার ওপরে। চামড়ার নিচে। কতটা দেবেন, কিভাবে মেলাবেন, আমি বুঝিয়ে দেব। যে সিরাম আছে, তাতে অনেক দিন যাবে।

'খারাপ হয়ে ঝাবে নে ?'

'না।'

'আমি ইঞ্জিশান দে বাঁচাতে পারব ?'

'নিশ্চয়।'

'শ্রীপদ দু হাতে মাথা চেপে বসে থাকল। তারপর চোখ মুছে বলল, 'পিত্তিপুরুষ গোঁসা হবে। হ'ক! আমারে ভগবান সবে ঝেনে আসে। কিছু কত্তে পরি নে গো! তেনারা ঝে বিদ্যে চাইপে দে গেচে, সে একন এক জগদ্দল বোঝা! নয় মন্দ হলাম, বেপতে গেলাম, মানুষ ত বাঁচবে!'

'হ্যাঁ, বাঁচবে।'

'তবে শেকাও ?'

'শেখাব, শেখাব।'

শ্রীপদর শেখার ক্ষমতায় বিস্মিত হয় বসন্ত। বসন্ত প্রথমে ওকে, নিজের ঘরে বসিয়ে হাতের ও পায়ের পেশীতে, চামড়ার নিচে ডিষ্টিল্ ওয়াটার ফোঁড়ে ও দেখায়। তারপর বসন্তর ওপর ও শেখা প্র্যাকৃটিস করে। ফলে দুজনেরই হাতে-পায়ে ব্যাথা হয়। কিন্তু শ্রীপদ খুব তাড়াতাড়ি শেখে।

অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও গরম জল ব্যবহার করতে শেখায় বসন্ত। ফুটন্ত গরমজলের তাপ দিতে শেখায় দুজনেই বেজায় উত্তেজিত ও আনন্দিত। শ্রীপদ বলে, 'আপনি মোরে ঝা শেকাচ্ছ তাতে মানুষ বাঁচে। মানুষ বাঁচলি বিষহরির কোপ নি।'

'কিসের কোপ?'

'তাই ত বলি! ঝে ঝুগে ঝা মন্তর! শালারা ছেলে বিয়োতে বউরে হাসপাতাল দেচ্চনা? টাইফায়েট হলে সেতা যাচ্চ না? সাপে কাটলে ডাক্তারের ইঞ্জিশান থাকলে দেচ্চে, তা নেচ্চ না?'

বসন্ত হেসে ফেলে। কলকাতার অদূরে এই নির্বান্ধব বেহুলায় অবস্থিতি শ্রীপদর কারণে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। শ্রীপদ বলে, 'শিয়ড় চাঁদার স্তি-পুরুষে বিয়ে পৌষ-মাঘে। এবার শালা অঘ্‌ঘানে ধান-কেটে সবাই চাঁদা করে কেরাচিনি কিনব, পাঁজায় আগুন দে বংশ লোপাট করব। ওঃ, সাপের আড়ত কি, ঝেমন মনসাপুরী!

এর পরেই হেদো নস্করের বালক মাহিন্দার শশী, সাপের ভয় ভুলে পাঁজা থেকে চারটি ইট সরাতে যায় এবং উরুতে কৃষ্ণ কালাজের ছোবল খায়। বসন্তকে ডেকে পাঠায় শ্রীপদ। বলে, 'বসাতে পারে নে গো, দাঁত ঘেঁষ দেচে মাত্তর!'

শশী ধরেই নেয় সে মারা যাচ্ছে এবং মনস্তাত্ত্বিক বিকলতায় কালাজে তেজুতে কামড়ের লক্ষণাদি ডেভেলপ করতে থাকে। শ্রীপদ ওকে প্রবল চিৎকারে গাল পাড়ে ও বলে, 'ঢং দেকাস না শশী!'

বসন্ত এসে দেখে বাঁধন-ছাঁদন শেষ। জল গরম হচ্ছে, নিসাদল রেডি। ও বলে, 'দিন ইঞ্জেকশন। যেমন দেখিয়েছি।'

'ছিরিপদ? ইঞ্জিশান দেবে?' সবাই খুব ঘাবড়ে যায়। শ্রীপদ এখন প্রখ্যাত বালককে অ্যানটিরেবিড ইঞ্জেকশন দান কালে লুই পাস্তুরের আত্মবিশ্বাসে গর্জে ওঠে, 'বিষহরির আজ্ঞায় ঝা কচ্চি তাতে ঝদি বিশ্বেস না পাস, তো ভাগ্‌ শালারা!'

ও ইঞ্জেকশান দেয় এবং চেঁচাতে থাকে,

"মা মনসা দয়া করে বিষয়ে পেরি ধরি।
ভুজঙ্গজননী ভুজঙ্গের বিষ নিলেন হরি॥

বিষ গেলেন সপ্ত স্বর্গের উপর দিকে।
মা মনসা দোহাই দিলেন শঙ্কর পিতার ॥
বিষ গিয়ে শঙ্করের হল কণ্ঠহার।
জয় জয় শুভঙ্কর শঙ্করের দোহাই ॥

বিজ্ঞান ও বিষহরি, উভয়ের সাধনা শ্রীপদ সুকৌশলে চালাতে থাকে। গরম জলে নিষাদল ফেলে ক্ষতস্থানে ঢালে। গরম জলের তাপ দেয়। ইঞ্জেকশান দেবার একঘণ্টা বাদে বাঁধন বদলে অন্যত্র বাঁধে এবং চেচাঁতে থাকে,

"ধ্বনি ধ্বনি ধ্বনি যার।
ধ্বনি বলিতে বিষ নাই আর ॥
হাড়ে মাসে ধ্বনি ফুটে।
ধ্বনি উড়িতে বিষ না উঠে ॥

বসন্ত যখন বলে, শশীর আর প্রাণের আশঙ্কা নেই, তখন শ্রীপদ তার ঝোলা গোছায়। শশীর মাকে বলে, 'নস্করের ঠেঙে চাল-ডাল মেঙে এনে মায়ের ভোগ দে। খুব চিল্লিয়ে কাঁদবি। বলবি, তোমার ইটের পাঁজা হতে সাপ কাটল, তোমারে দিতি হবে।'

'সে আর বলতি? দুগ্‌গা ক্যাওরানী হেদো নস্কররে ছেড়ে দেবে? ওই পাঁজা হতে সব্বনাশ হচ্ছিল! তা ছিরিপদ! মা আজ্ঞা দেচে ইঞ্জিশান দিলে?'

'ব্বাপ রে, তেনার আজ্ঞা না হলি পারি? এত অবিশ্বেস কেন গো? জান দে তোমাদের জান রাকি, তা কোনদিন কলাটা কচুটা নিচ্চি? তোমরা বাচা গুখেগো, ডাগলে পরে না এলে ঠিক হতু।'

শশীর মা শ্রীপদর পায়ে পড়ে ও সমবেত সবাই শশীর মাকে গাল পাড়ে। শ্রীপদ দক্ষ অভিনেতা। ও বোঝে, মঞ্চ এখন তার। তাই বলে, 'আরো কতা আচে, সবাই শোন!'

'বল হে। মরা ছেলে জীয়ালে তুমি!'

'মায়ের সেবক, মায়ের সেবক, তিনি না বললে পারি? তিনিই

স্বপ্ন দেলে বসন্তরে পাট্যো দিচ্চি। সে তোরে শেকাবে সকল। বললে বেউলোর আবুস্তা দেকে মনে বড় কষ্ট!'

'বল গো!'

'হেদো নস্কর সরকারের কেরাচিনি নে ঘরে ডিম ফোটাচ্ছে। ওর পাঁজা হতে সব্বনাশ, তা ও দেবে নে! এবার অঘ্ঘানে ধান তুলে দে আমরা সবাই চাঁদা তুলে কেরাচিনি কিনব।'

'কিনে?'

'পাঁজায় আগুন দে শিয়ড়চাঁদার বংশ নিবংশ করব। নইলে বাঁচবুনি।'

'তাই হবে! তাই হবে!'

বেরিয়ে এসে শ্রীপদ বলে, 'এখন নাচতেছে সব! তকন দেকবেন সবাই পাশ কাটাবে। নিঝের ভাল নিঝে বোঝে নে এরা! সবাই গুখেগো।'

তারপর বলে, 'আজ এট্টা কি দিন! আমি ইঞ্জিশান দিলাম, শশে বাঁচল? অ্যাঁ?'

'কিন্তু স্বপ্ন-টপ্ন, ও কি বললেন?'

'সত্যি!' শ্রীপদ বসন্তর হাত চেপে ধরে। বলে, 'মায়ের আমার অনেক দয়া গো! আপনারে "হ্যাঁ" বলে থেকে মনস্তাপ হইছিল খুব। তা রাতে মা ওই শিয়ড়চাঁদার গওনা পরে স্বপন দেকাল। বলল, ঝা তুই। ওরে আমি পাট্যেচি।'

বসন্ত বোঝে, শ্রীপদর স্বপ্ন দেখাটি অটোসাজেশন। ওইভাবে ও আদিম বিশ্বাসের কাছে, এখন অবিশ্বাসী হয়ে, বিজ্ঞানে উত্তরণের জন্যে ক্ষমা চাইছে। এও বোঝে, শ্রীপদর মনের এসকল জট ওপড়ানো ওর সাধ্যি নয়। শ্রীপদর পক্ষে অন্ধকার ত্যাগ করে জ্যোতির্ময় হওয়া সম্ভব নয়। অন্ধকার ও আলো সহাবস্থান করবেই। কেননা, নামেই বিংশ শতকে আছে শ্রীপদ। আসলে নাগরিকের সকল সুবিধায় বঞ্চিত অন্ধকার জীবনে ওর বাস। বিষহরিকে বর্জন করা ওর সাধ্য নয়।

শ্রীপদ বলে, 'কাল হাটে যাব। কাল রাতে আমার ঘরে খেতে হবে কিন্তু। এ আমার গুরুদক্ষিণা।'

'খরচ করবেন?'

'করব না? শালার মাচ আনব, আলু আনব, আমার পরিবার সরা পিঠে ভাজবে। খুব খাব।'

বসন্ত সকালে ইরফানপুর চলে যায় ও দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে আসে। সন্ধেয় বেরোবার সময় হেদো নস্কর বলে, 'ছিরের বাড়ি খেতে যাচ্ছেন! এতে ছোটলোককে আশকারা দোয়া হয়।'

বসন্ত হাসে ও বলে, 'ও আমার বন্ধু।'

'বন্ধু!'

'হ্যাঁ। আর, আমি ত এখানে থাকব না। আমার জন্যে ও আশকারা পাবে না।'

হেদো সত্যিই বিভ্রান্ত। সে বলে, 'নকশালরা, এসব বলত বটে! আপনি ত তা নন?'

'না, না, মোটেই নয়।'

'গ্রাম দেশ! সমাজ আচে হেতা!'

'আমি চলি।'

'ছিরে না কি ইঞ্জিশান দিয়েচে?'

'হ্যাঁ।'

'বিষহরির আজ্ঞায়?'

'তাই তো বলছে।'

'মা আজ্ঞা দিল?'

'কি করে জানব বলুন? ও-ই পুজো করে, ও-ই জানে, মিছে কথা বলার মানুষ কি?'

'না না! জিব খসে যাবে সে কথা কইলে। তা দিক। গাঁয়ের ভাল হ'ক।'

'ভালই হবে।'

'আমি ত শুনেই শশের মারে চাল-ডাল-মশলা দিইচি। মায়ের ভোগ দিক। বেটা বাঁচল।'

'ও বাঁচল, কিন্তু আপনার পাঁজার ব্যবস্থা না করলে সবাই বাঁচবে না।'

'দেকি। দর পেলেই ঝেঁপে দোব।'

শ্রীপদর বাড়িতে টেমির আলোয় হাঁসের মাংস, কচুঘণ্ট ও ভাত খাওয়া হয়, রসগোল্লা। খাবার পর শ্রীপদ বলে,

'মায়ের গান শুনবেন ?'

'নিশ্চয়।'

মনষামঙ্গলের গান। রাত বাড়ে। শেয়াল ডাকে। চারদিক নিঃশব্দ। বসন্তর মন ভরে যায়, ভরে যায়।

কয়েকদিন বাদে তামলীতে ডাক পড়ে শ্রীপদর। স্কুলের মাস্টারকে সাপে কেটেছে। শ্রীপদ যায়, চেষ্টা করে খুব। কিন্তু সাপে কাটার পর আট ঘণ্টা কেটে গেছে বলে মৃতদেহেই চেষ্টা করতে হয়। এতে বসন্ত বোঝে, শ্রীপদর একটা নতুন পরিচয় গ্রামাঞ্চলে ছড়াচ্ছে। তামলীতেও সাপের ওঝা আছে। ভূষণ মাল। ভূষণই শ্রীপদকে ডাকতে বলেছে। এটি খুবই দ্যোতক। ভূষণ স্বগ্রামে শ্রীপদকে ডাকা মানে শ্রীপদর ইঞ্জেকশন দেবার কথা সে জেনেছে।

এই ভাবেই দিন যায়। শ্রীপদ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারের সহায়তায় বসন্ত, তার পেপারের কাজ করে চলতে পারে। ঘোড়ার প্লাজমা-সিরামে যারা অ্যালার্জিক নয়, তারাও, প্রতিরোধহীন শরীরে সেকেণ্ডারি সিম্প্‌টম ডেভেলপ করে মারা যেতে পারে। খাদ্যহীন, পুষ্টিহীন শরীর। শোথ, স্ফীত প্লীহা, উদরাময়, দাঁতের ক্ষত, ঘা এদের নিত্য সাথী। অতএব অন্যান্য লক্ষণ দেখা দেয়।

মরে, মানুষ মরে। কিন্তু, যে সব রুগী বেঁচে যায়, তারা ডাক্তারকে মনের জোর জোগায়, শ্রীপদকে। শ্রীপদর কাছে বসন্ত নতুন করে সব শেখে। সর্পদষ্ট রোগী ভয়েও মরে, তা বসন্ত পড়েছে।

সে ভয়ের চেহারা, রক্তমাংসের চেহারা শ্রীপদ ওকে দেখিয়ে দেয়। বলে, 'রাজীব ধোপার মরণটা দেখলেন? আমি গেলাম হাটে। ওরে কাটল ঢ্যামনা, ডাকল বামনা। ভয়ের চোটে বুকের ধুকধুকি থেমে গেল। বউ কাঁদল, কোতা গেচলে বাবা গো, তুমি রইলি ওর কিচু হতুনি। ঢ্যামনা কাটলি মনে জানে তিনি কাটল। বাস্! এতেই আমাদের শাস্তরে বলেচে, রুগীরে একা রাকবে নি, বকে হ'ক, মেরে হ'ক, মনে বল জোগাবে।'

'ভয়ে হার্টফেল করল।'

'এ ভয়ের নিরসন কী, বল?'

'ছেলে শিখছে?'

'নিশ্চয়? বেটা মন্তরতন্তর শিখতে আসেনে। একন ইঞ্জিশানে খুব উৎসাহ। তবে লক্কন তো বোজে নে সকল? ওর হাতে ছাড়ি নি।'

'বাঁধন না বদলালে গ্যাংরিন, আর ঝপ করে খুললে মরণ, সেটা শেখাবেন।'

'সব, সব শিকুচ্চি! পয়সা ত নিই নি, তাতে নিশিকান্ত জেলে এট্টা ক্যাঁটালকাটের বাক্স করে দে গেচে। ওর মারে বাঁচালাম? বলে, এতে ওষুদ ইঞ্জিশান রাকো। মায়ের নামে দিব্বি। তুমি আর তোমার ইঞ্জিশান একন ভস্সা। তা আপনার কাজ হচ্ছে?'

'নিশ্চয়। এখানে না এলে জানতেই পারতাম না উপোসী শরীরে ইঞ্জেকশান পড়লেও কত লক্ষণ দেখা দেয়, কী ভাবে মানুষ কষ্ট পায়।'

'হেদোরে ত কাটবে নে। তা'লে ঝানতেন হাতির আহার করা শরীলে কী কী লক্ষণ দেকা ঝায়। ওরে সাপেও কাটবে নে। কাটলে বুঝি বা সাপই মরে ঝাবে! বাপ রে! নক্কর বলে কতা!'

'আমার যাবার সময় হল।'

'সে ভাবলি ত কষ্ট হয়!'

'আবার আসব হয় ত।'

'দেখুন। কাজে পড়লি কি আসা চলে? না একবার বেরুলি এই গয়েলে আবার গরু সাঁদায়?'

'আপনার মনসার গায়ে ও কি কালাজের চামড়ার গয়না? বেশ দেখতে হয়েছে ত?'

'ওই, মাত্তে হয়, চামড়া খসিয়ে গওনা কত্তে হয়। আমাদের ঝা নিয়ম। মালেরা নিয়ম রাকে নে সবে। একন ত দাঁড়াস মাত্তেছে, চামড়া বেচতেছে কলকেতায়। গোখরো পেলি ত দুনো লাভ।'

বসন্তর চলে যাবার সম্ভাবনায় হেদো নস্কর খুবই খুশি হয় ও ইরফানপুরে থানায় বসে মনের কথা বলে আসে। বলে, 'হাকিমের শালা, তাতেই কিচু বলি নে। নইলে নকশালের কাঁদে হাগতেচে। ছিরিপদর সঙ্গে ওটা-বসা। ছোটজাতরে ইঞ্জিশান দিতেচে, সেতা ভাত খাচ্চে। ধান ওটার কালে বেটাদের বাগে রাকা মুশকিল হবে। ওর দুদিনের খেলা, আমাকে মেরে থুয়ে যাচ্চে।'

'কোন গণ্ডগোল পাকাচ্ছে না কি?'

'পাকায় নি বটে, কিন্তু গেরামের হাওয়াটা তো পালটে দিল? ছিরে মাল জুতো পায়ে, টচবাতি জেলে ঘুত্তেছে? ছোট জাত ঝকন জুতো পরবে, তকন ঝানবেন ঘোর কলি। কী? না সাপে কাটবে। কাটবে ঝকন, তকন কি জুতো পরে আটকাবি? তোর সাধ্যি আচে?'

বিষহরি সম্ভবত হেদো নস্করের কথাগুলি শোনেন।

রাতে ঘুমের মধ্যে বসন্ত শোনে দরজায় ধাক্কা এবং কার বিপন্ন কণ্ঠে ডাক। ধড়মড় করে ওঠে ও, দরজা খোলে। স্বয়ং হেদো নস্কর, আরো কয়েকজন, শ্রীপদর ছেলে পতিত। পতিত কেঁদে ওঠে, 'ইঞ্জিশান নে চল বাবু! বাবারে……বাবারে……!'

'শ্রীপদকে?'

'হ্যাঁ বাবু, ঘুমের মদ্দে বগলে……'

হঠাৎ জায়গাটি তীব্র আলোয় ঝলকায়। শশীর হাতে পেট্রোম্যাক্স।

জ্বলছে। হেদো নস্করের কণ্ঠেও ভয়। শ্রীপদকে সাপে কাটার গুরুত্ব তিনিও বোঝেন যেন। বলেন, 'আলো নিয়ে যাই।'

'আপনি যাবেন?'

'ছিরিপদ……!'

বসন্ত টর্চ নিয়ে দৌড়য়। কাঁধে ঝোলা। শ্রীপদকে সাপে কাটল। শ্রীপদকে?

উঠোনে ও ঘরে ভিড়। সকলকে ঠেলে সরায় বসন্ত, ভেতরে ঢোকে। কারা কেঁদে ওঠে, 'মালরে বাঁচিয়ে দাও বাবু। ও নইলে বাঁচবুনি!'

শ্রীপদ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। সামনে একটি নিহত কালাজ। শ্রীপদর হাত তুলে স্ত্রীর কাঁধে রাখা। স্ত্রী অঝোরে কাঁদছে। বগলে চেরার ক্ষত। শ্রীপদর দু চোখে ঘুম। চোখের পাতা নামছে বারবার, টেনে টেনে খুলছে।

'শ্রীপদ?'

'বাবু? বসন্ত বাবু?'

'গরম জল ফোটাও কেউ, অনেক জল। হ্যাজাক এখানে রাখ। শ্রীপদ! আমি ইঞ্জেকশান দিচ্ছি।'

ইঞ্জেকশান দিতে বসন্তর হাত কাঁপে। শ্রীপদ ক্ষীণ হাসে ও অনেক দূরে চলে যেতে যেতে বাতাসে গলা ভাসিয়ে দিয়ে সুদূরের কণ্ঠে বলে, 'বাঁদন দিতে চাইল পতিত, বাঁদন কোতা দেবে?'

'শ্রীপদ! সবচেয়ে বেশি ডোজ দিলাম।'

'দাও!'

বসন্ত নির্মমভাবে শ্রীপদর বগলে কাটতে থাকে। শ্রীপদ আবার হাসে ও বলে, 'কোন সাড় পাচ্চি না। কাজ হবে নে বাবু। তুমি বোস!'

গরম জল। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড। প্রত্যেকটি চেষ্টা বৃথা জেনেও বসন্ত যুঝতে থাকে।

শ্রীপদ অনেক দূর থেকে বলে, 'হোতা কাটলে কি কাজ হয় বাবু? বগলে আর হাট্যে তফাত নি, তুমি ঝে বল?'

'শ্রীপদ, তাকাও।'

'চোকে দিষ্টি নি বাবু। আর ঘুম। আর ঘুম।'

'গরম জলের হাঁড়ি? কম্বলের আসনটা দাও।'

কম্বলের পুজো করার আসনে বগল জড়িয়ে গরম জলের ভাপ। সাড়া নেই শরীরে, সাড়া থাকে না। বসন্ত শ্রীপদর নাড়ি দেখে, বুকে কান পাতে।

শ্রীপদ অমানুষী চেষ্টায় চায় ও জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'ইট বেচল না নস্কর।'

বসন্ত কান চেপে থাকে বুকে। তারপর আস্তে আস্তে ওঠে। শ্রীপদকে আস্তে শুইয়ে দেয়। তারপর হা হা করে কেঁদে ওঠে ও মুখ ঢাকে। বেহুলার শতাধিক লোক এক সঙ্গে কাঁদে। রাতটা চমকিত হয়। কালাজের পুরোন চামড়ার শিরোভূষণ পরে পেতলের মনসা একই দৃষ্টিতে সস্নেহ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকেন।

সকাল হয়। সর্বনাশের সকাল যেন। কী করে খবর যায় কে জানে। তামলী, বকুলপুর, গাঙটি ও ফুলে গ্রাম থেকে মালেরা আসে। এখন বসন্ত দর্শক মাত্র। এতে ওর কোন ভূমিকা নেই। কলার ভেলা তৈরি হয়। তাতে বিছানা। শ্রীপদর ধূসর শরীর শায়িত। মালেরা একে একে ভেলায় ছোট ছোট সরা রাখে। চাল-তুলসীপাতা। প্রণাম করে শ্রীপদকে।

বিশাল, গ্রামের পক্ষে বিশাল ও দীর্ঘ শবযাত্রা। সবাই হরিধ্বনি দেয় ও চোখ মোছে। পুরুষরা নির্লজ্জায় কাঁদে। বেহুলায় ভেলাটি নামানো হয়। সবাই এখন পাশে পাশে হাঁটে। ভেলাটি টানতে বৃদ্ধা বেহুলার মাজা ফাটে। অভিশপ্ত সে, অভিশপ্ত। ধীরে, অতি ধীরে ভেলা চলে। বসন্ত হাঁটতে থাকে। ভুতেপাওয়া মানুষ যেন। হাঁটতে হাঁটতে সবাই এবার থমকে দাঁড়ায়। বাঁওড়। এখানেই ভেলা পাক খায়। নিয়ম। ভেলাটির দিকে চেয়ে যারা দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের চোখে অন্ধকার, এ রোদ ও দিনের দৃশ্য অন্ধকার।

কে যেন বলে, 'সাত বার ভেলা ঘোরাবে, তা বাদে ভুইবে নে তামলীতে তুলবে।'

তারপর সবাই বিস্ময়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে। কেন না ভেলাটি, সকলকে চমকিত ও সন্ত্রাসিত করে মন্থরে পাক খায়, কেবলি পাক খায়। বাতাসে শ্রীপদর মুখের চাদর উড়ে যায় ও বসন্ত সভয়ে বোঝে, শ্রীপদর আধবোজা চোখে একা তার প্রতি অভিযোগ। তার তিরস্কার। মানুষ, সর্পদংশনভীত মানুষ রিসার্চ পেপার নয়, বিবাদী বাগের দপ্তরে দশমিক-পরিসংখ্যান নয়। মানুষ বিনশ্বর। তাই মানুষের সহায়তা প্রয়োজন, ভয় দূর করা প্রয়োজন, প্রয়োজন তাকে বাঁচানোর।

শশীর মা ফুকরে ওঠে, 'অনাথ করে রেকে যাচ্চ বাবা, তাতেই ঝেতে পাচ্চ না? তাতেই ঘুরে ঘুরে দেকতেচ?'

তারপর যেন মৃত শ্রীপদ বোঝে, পিতৃদত্ত দায়িত্ব সে নিয়েছিল। তার সে দায়িত্ব নেবার কেউ নেই। পতিত কিছুই শেখে নি। বসন্ত চলে যাবে। পিণ্ডদানের অধিকার সে পতিতকে দিয়ে গেল, কিন্তু তার উত্তরাধিকার নিতে কেউ রইল না। শ্রীপদর উত্তরাধিকারী ত পিণ্ডদান করলেই হওয়া যায় না। যেন গভীর হতাশায় শ্রীপদ নদীকে কিছু বলে। বেহুলা বাঁওড়ে এবার টেনে নেয় ভেলাটি।

বসন্ত ফিরে আসে। সারাদিন বিছানায় পড়ে থাকে ও; অস্নাত অনাহারী। সারা রাত।

সকালে ও হেদো নস্করকে ডাকে। বলে, 'কেরোসিন বের করে দিন। সরকারী কেরোসিন।'

'কী হবে?'

'দেখতে পাবেন।'

'কিন্তু, কী হবে তা না বললি···' হেদো নস্কর আরো কথা বলতে চায়। শ্রীপদর মৃত্যুতে সেও মর্মাহত। কিন্তু কেরোসিন মানে অথরিটি হাতে রাখা। বসন্ত ওকে কোন কথাই শেষ করতে দেয় না।

'আগে গ্রামের সকলকে ডাকব নস্কর বাবু, কেরোসিন বের করাব।

তারপর এস. ডি. ও.কে জানাব। তারপর কলকাতায় গিয়ে যা করবার করব। আপনার ইটের পাঁজা…এস. ডি. ও. শুধু আমার ভগ্নীপতি নন, জবরদস্ত লোক। কোরোসিন আপনি এদের পারমিট থাকলেও দেন না, মজুত করেন। মজুত করেন আপনি, আমি জানি না? পঞ্চায়েতে প্রধান হয়েছেন! কীর্তিকলাপ জানলে প্রধান রাখবে আপনাকে?'

হেদো নস্কর, শান্ত ও নির্বিরোধী বসন্তর চোখে নিজের আপাত-পরাজয় সংবাদ পড়ে এবং তারও মনে হয়, বড় বেশি বিচ্ছিন্ন গ্রাম, থানা ইরফানপুরে। মনে ভিত্তিহীন ভয়। সত্তর-একাত্তরে এ-হেন ভয়ের তাড়নেই ও পালিয়েছিল।

'নিন, ক টিন নেবেন।' শুকনো গলায় বলে ও।

'এক টিন রেখে সব নেব। শশী! চরণ, সাগর, রাবণ, নিশিকান্ত সকলকে ডাক্। বিশ জন লোক চাই।' বসন্তর গলায় ও মনে হিংস্র আনন্দ। নস্করের পাঁশুটে মুখ দেখে এত আনন্দ পাবে তা ও বোঝে নি।

'হোস পাইপগুলোও দেবেন। গ্রামে আগুন নেভাতে সরকার দিয়েছে। আপনি বেগুন গাছে জল দেন।'

চরণরা সবাই আসে। বসন্ত বলে, 'টিন নাও, পাইপ নাও, তারপর যত পার খড় আন।'

চরণরা ওর দিকে তাকায় শ্রীপদর মৃত্যুর প্রচণ্ড আঘাত, শোক, বিমূঢ়তা সব সত্ত্বেও বসন্ত ওদের জীবনের উজানমুখী প্রবহমানতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

'বড় বড় বাঁশ নিয়ে চল। মেয়েছেলে, ছোট ছেলে কাছে আসে না যেন।'

খড়ের আঁটি ছিঁড়ে পাঁজা করা হয়, পাঁজায় ছুঁড়ে ফেলা হয়, হতে থাকে। খড়ের নিচে ক্রমে চাপা পড়ে পাঁজাটি। পাঁজা ঘিরে খড়ের পাঁচিল। আগুন বিষয়ে অভিজ্ঞ শ্মশান-ডোম সাগর বলে, 'ছেলেরা

খেয়ে কুলগাছ কাট গা। শঁসানে বিস্তর। একবার আগুন ধরলি নিভবে না।'

চরণ বলে, 'ঘর ঘর হতে তুঁষ চেয়ে আন্ গা। শীতে আগুন পোহাবে বলে সকলা থুয়েছে।'

খড়ের পাঁচিল ও পাঁজা-ঢাকা খড়ে কেরোসিন স্প্রে করা হয়। বসন্ত বলে, এক সঙ্গে চারদিকে আগুন দেবে। ন্যাকড়া জ্বালিয়ে ছুঁড়বে। খড়ের পাঁচিল যেন না নেভে। সমানে খড় ফেলবে। সাপ বেরোতে দেখলেই লাঠি পেটাবে।'

'সে আর বলতে হবে নি বাবু, ছিরিপদরে খেয়েচে ঝকন, তকন আর বাঁচতে হচ্চে নি।'

আগুন জ্বলে। ধু ধু করে। সবাই সাগ্রহে দেখে। এবার বাইরে থেকে, অভ্যস্ত দক্ষতায় বাঁশের খোঁচা মেরে সাগর ডোম পাঁজা খুঁচিয়ে ইট ফেলতে থাকে ও বলে, 'সকলা খোঁচা মার্। সুমুন্দিরা নামুতে সাঁদাচ্ছে। হুই, হুই দেখ্!'

আগুনের তাপে ছিটকে পড়ে কালাজ। সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, নতুন উদ্দীপনা পায়। খড়ের পাঁচিলে কাঠ পড়ে, কেরোসিনের পিচকিরি। সাপ বেরোতে থাকে। মরতে থাকে। গ্রামের লোকগুলির শোক, কালাজ বিষয়ে ভয়, হেদো নস্করের ওপর রাগ, সব উত্তরিত হয় এক্ষণিক প্রজ্বলন্ত ক্রোধে। আগুন তাই ভীষণ জ্বলে।

———